সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসার

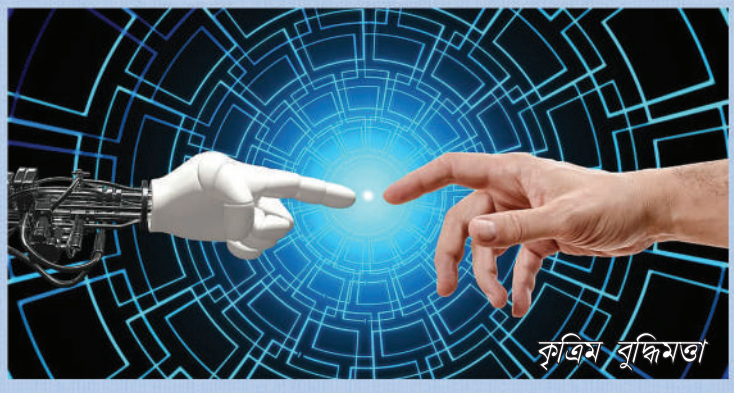
বিজ্ঞান অন্বেষক

ISSN 2582-5674
RNI : WBBEN/2003/11192
www.bigyananneswak.org.in

বর্ষ -২১ সংখ্যা-৩
মে-জুন ২০২৪
মূল্য : ২০ টাকা




মেঘনাদ সাহা


কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা


পেঙ্গুইন

এই সংখ্যায়

❑ ভাইরাস : বিশ্বাস, বিসম্বাদ, বিজ্ঞান ❑ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ❑ সমুদ্রের গোপনকথা ❑ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ❑ সাপ : শত্রু নয়, বন্ধু ❑ জলের নিচ দিয়ে রেলপথ ❑ ইতিহাসের সাক্ষ্য: জীবাশ্ম ❑ পোকামাকড়ের দাম্পত্য জীবন ❑ বড়ো বিড়াল ❑ সেন্টিনেলী ও জারোয়া ❑ সংবাদ ❑ চন্দ্রালোক অভিযান ❑ মিরার নিউরোন ❑ মরুভূমিতে বন্যা ❑ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি ❑ ৩য় প্রচ্ছদ : বিষধর সাপ ও কামড়ের রঙিন ছবি ❑ ৪র্থ প্রচ্ছদ : যারা হারিয়ে যাচ্ছে।

সূচি

১ আমাদের কথা

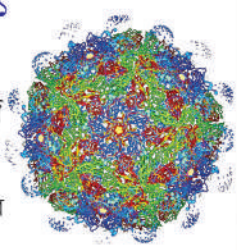
সুভাষিতম



২ প্রচ্ছদ কথা-১

ভাইরাস : বিশ্বাস, বিসম্বাদ বিজ্ঞান

সন্দীপন তালুকদার ও রাজর্ষি ঘোষ



৮ প্রচ্ছদ কথা-২

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা

রাজদীপ ভট্টাচার্য



১১ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান



অনিন্দ্য দে — চন্দ্রালোক অভিযান

১২ প্রচ্ছদ কথা-৩

রণজিৎ পাল — সমুদ্রের গোপন কথা



১৭ প্রচ্ছদ কথা-৪

শামীম হক মণ্ডল — কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা



১৯ জলপাইগুড়ি সায়েন্স এ্যান্ড নেচার ক্লাব

সাপ—শত্রু নয় বন্ধু



২১ জলের নিচে ছুটে যায় রেল

তরুণ রায়চৌধুরী



২২ কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য—জীবাশ্ম



২৪ পোকামাকড়ের দাম্পত্য জীবন



প্রবীর বসু

২৫ বড়ো বিড়াল



আবু হানিফ শেখ

২৬ সেন্টিনেলী ও জারোয়া জনগোষ্ঠী



অজয় মজুমদার

১৮ ব্লিচিং ছড়িয়ে মশা নিধন নয়

সংবাদ ১



২৭ বসুন্ধরা দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদ ২

২৮ এম্প্যাথেটিক মিরার নিউরোন

দিগন্ত পাল



৩০ মরুভূমিতে বন্যা

অজয় নাথ



৩১ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি



মৃদুল শ্রীমানী

বিষধর সাপ ও কামড়ের রঙিন ছবি — ৩য় প্রচ্ছদ



৪র্থ পরিচ্ছেদ — যারা হারিয়ে যাচ্ছে

ড. রাজা রাউত



বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

প্রবীর বসু

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, চন্দনসুরভি দাস, দীপাঞ্জন দে, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, তুষার কান্তি নাথ, শতাব্দী দাশ, সোমা বসু, অর্চন সমাজদার, উজ্জ্বল কান্তি রায়, রিঙ্কু দাস, মোহা: গোলাম হামজা (রাহুল), কিঞ্জল বিশ্বাস

উপদেষ্টামণ্ডলী

শঙ্করকুমার নাথ, দীপককুমার দাঁ, সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, রাজা রাউত, তপন দাস, মানসপ্রতিম দাস, সুমিত্রা চৌধুরী, জয়শ্রী দত্ত, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তপন সাহা, সৌমেন বিশ্বাস

: website :
www.bigyananneswak.org.in/
ssu2011.com/bigyananneswak
e-mail :
bigyanannesak1993@gmail.com.
Mobile & Whatsapp No.
9830676330 / 9143264159/7980121478

প্রচ্ছদ বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা

টিম বিজ্ঞান অন্বেষক

সুভাষিতম

জন্ম : ০৩.১০.১৮৯৩ মৃত্যু : ১৬.০১.১৯৫৬



প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বেকার কথা, আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইয়াছে। ঢাকা শহরনিবাসী (অর্থাৎ আমার স্বদেশবাসী) কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল আমি কী বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি প্রথম জীবনের উৎসাহভরে তাহাকে আমার তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে (অর্থাৎ সূর্য ও নক্ষত্রাদির প্রাকৃতিক অবস্থা, যাহা Theory of Ionisation of Elements দিয়া সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়) সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দুই-এক মিনিট পর পরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, "এ আর নূতন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদে আছে।" আমি দুই-একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম, "মহাশয়, এসব তত্ত্ব বেদের কোন অংশে আছে, অনুগ্রহপূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি? তিনি বলিলেন, "আমি ত কখনও 'ব্যাদ' পড়ি নাই কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবী কর সমস্তই 'ব্যাদে' আছে।" অথচ এই ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(সবই ব্যাদে আছে/মেঘনাদ সাহা অংশবিশেষ)

আমাদের কথা

বিজ্ঞানমনস্কতা

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বুঝেছিলেন দেশের উন্নতি করতে গেলে হাত ধরতে হবে বিজ্ঞানের এবং সেই বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিজ্ঞানের সুফলগুলি মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছে। কিন্তু তার পিছনের বিজ্ঞানের কার্যকারণ বুঝতে পারছে না। একইসঙ্গে আমাদের দেশের কর্তারা বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাকে বিজ্ঞান বলে চালাতে চাইছেন। পুরাণকে চালানো হচ্ছে ইতিহাস বলে। সুপরিকল্পিতভাবে মুক্ত চিন্তার প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আজও কুসংস্কারের বলি ডাইনি হত্যা, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, কন্যা সন্তান হত্যা, পণ্যের জন্য হত্যা, এমনকি বাল্যবিবাহ হচ্ছে নিয়মিত। যার ফলে সমাজের বহু মেয়েরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এইরকম কঠিন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার সত্যিই খুব কঠিন কাজ। বিজ্ঞান সংগঠনগুলি নিজেদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে ছোটদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার প্রচার ও প্রসার ঘটানোর দায়িত্ব মূলত বর্তায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বাড়িতে বাবা-মায়ের উপর। মায়েরা গড়ে তোলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। মায়েরা শৈশব থেকে শিশুকে সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে শেখালে তারা ছোট থেকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শিখবে।

বিজ্ঞান দরবারের তরফে বিজ্ঞান মনস্কতার লক্ষ্যে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রচারসূচিতে নানারকম অনুষ্ঠান যেমন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা, বিজ্ঞান ক্যুইজ, প্রাত্যহিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাতে কলমে শিক্ষার নিয়মিত আয়োজন আমরা করে চলেছি। এই প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান মানসিকতার প্রচার ও প্রসার। এই বিজ্ঞান মনস্কতা থেকেই তৈরি হবে যুক্তিবোধ এবং এর সাথে সাথে তৈরি হবে মুক্ত চিন্তার প্রসার।

ISSN 2582-5674

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রিন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৭৯৮০১২১৪৭৮/৯২৩১৫৪৫১৯১/৯৪৩২৩৩৫৮৮২/৮৯৪৪৯৯৬৭৫৫/৭০০১৩৩৭৭১৪/৮২৪০২৪৪৩২৩

সন্দীপন তালুকদার[১] ও রাজর্ষি ঘোষ[২]

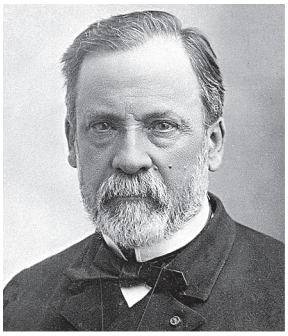
ভাইরাস
বিশ্বাস, বিসম্বাদ, বিজ্ঞান

১ম পর্যায়
(ক) অন্ধকারের উৎস...
তামাক পাতার অজানা রোগ

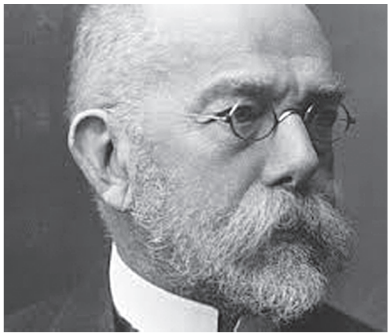


টোবাকো মোজাইক ভাইরাস আক্রান্ত তামাক পাতা

সময়টা উনিশ শতকের মাঝামাঝি। ইউরোপে তখন তামাক চাষের ভীষণ রমরমা। তামাক বিক্রি করে ভালো দাম পাওয়া যায় আর এর আন্তর্জাতিক বাজারও বেশ ভালো হওয়ায় তামাক হয়ে উঠেছিল ইউরোপের প্রধান অর্থকরী ফসল। কিন্তু ১৮৫৭ সালে নেদারল্যান্ডের (তৎকালীন হল্যান্ড) তামাক চাষীরা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে তামাক গাছে এক অদ্ভুত রকম রোগের মড়ক দেখা দিয়েছে। কচি তামাক পাতা এই রোগের প্রভাবে কুঁকড়ে গিয়ে স্থানে স্থানে গাঢ় সবুজ, হলদে বা ধূসর বর্ণ ধারণ করছে। আর যেহেতু তামাক পাতাই তামাক চাষে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই রোগের প্রভাবে প্রায় ৮০% ফসল নষ্ট হতে বসে। অতি দ্রুত এই অদ্ভুত রোগ এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। স্থানীয় চাষীরা এর আগেও ফসলের নানারকম অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করতেন। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তারা এর জন্য প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা বা কোনো অপদেবতার কুদৃষ্টিকেই দায়ী করে এসেছেন। আসলে সংক্রামক রোগের প্রকাশ এবং রোগ বিস্তারের কারণ সম্পর্কে সে সময় সাধারণ মানুষের মনে কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপের মানুষের বিশ্বাস ছিল যে সুস্থ জীব রোগাক্রান্ত হয় 'Miasma' (প্রাচীন গ্রীক ভাষায় যার অর্থ ছিল "দূষণ") বা এক প্রকার দূষিত বাতাসের কারণে যা সম্ভবতঃ কোনো পচা গলা জৈব বস্তু থেকে নির্গত হয়। যদিও প্রায় ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কিংবদন্তী ভারতীয় ঋষি সুশ্রুত সংক্রামক রোগ বিস্তারের জন্য অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তির দৈহিক সংসর্গকেই দায়ী করেছিলেন। ১৮৫০-এর দশকে ফরাসী রসায়নবিদ্ ও জীববিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এবং পরবর্তীতে জার্মান চিকিৎসক তথা অণুজীববিজ্ঞানী রবার্ট কচের যুগান্তকারী



লুই পাস্তুর



রবার্ট কচ

গবেষণার হাত ধরে ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে 'Germ theory of disease' প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যদিও সংক্রামক বস্তুরূপে ভাইরাসের অস্তিত্ব তখনও কল্পনাতীত ছিল। এই তত্ত্বে সংক্রামক রোগ বিস্তারের জন্য অতি ক্ষুদ্রাকৃতি কিছু জীবকণা (অণুজীব) যেমন, ব্যাক্টেরিয়া, এককোষী আদ্যপ্রাণী (প্রোটোজোয়া) বা ছত্রাককেই দায়ী করা হয়। কিন্তু ১৮৪০ এর দশক থেকে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল। এই সময় প্রায় সমগ্র ইউরোপ জুড়েই আলু গাছে মড়ক লাগে। আয়ারল্যান্ডে এই মড়ক এতোটাই মারাত্মক আকার ধারণ করে যে আলুর চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়। আয়ারল্যান্ডের সাধারণ মানুষ যেহেতু দৈনিক খাদ্যের জন্য আলুর ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিলেন তাই এমতাবস্থায় সমগ্র আয়ারল্যান্ড জুড়ে শুরু হয় চরম দুর্ভিক্ষ। ঐতিহাসিকরা পরবর্তীকালে একে 'Irish Potato Famine' বলে উল্লেখ করেন। স্থানীয় চাষীরা যদিও একে অপদেবতার কুপ্রভাব বলে মনে করলেও এই ব্যাখ্যা সে কালের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তারা লক্ষ্য করেন যে একই রকম রোগ লক্ষণ পার্শবর্তী অনেক অঞ্চলেই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই তারা আলু গাছের এই অস্বাভাবিক রোগের নাম দেন ধ্বসা রোগ। সে দশকের মাঝামাঝি ব্রিটিশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মাইলস্ বার্কলে (Miles Berkeley) প্রথম এর কারণ খুঁজে বের করেন। তিনি জানান এই রোগের কারণ হল এক বিশেষ ধরনের ছত্রাক *Phytophthora infestans*। বাতাসের মাধ্যমে এই ছত্রাকের রেণু ছড়িয়ে যায় এবং এর ফলেই পার্শবর্তী অঞ্চলের

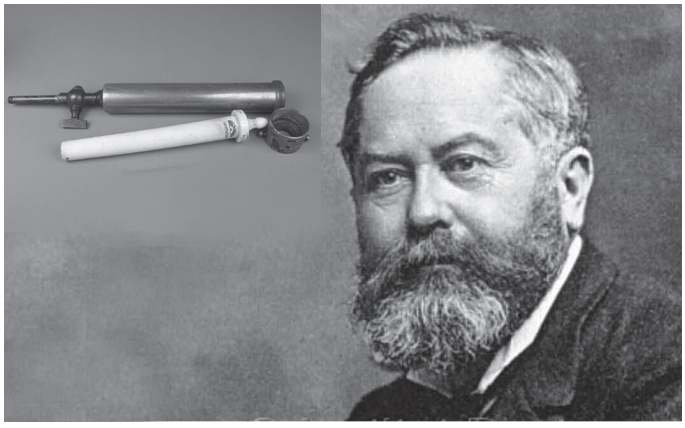


মাইলস্ বার্কলে

আলু গাছে রোগের প্রকাশ ঘটে। এই ভাইরাসের রেণুগুলি এতোই সূক্ষ্ম যে খালি চোখে এদের দেখাই যায় না। এই সময় থেকেই মানুষ বুঝতে পারে যে বাতাসে এমন অতি সূক্ষ্ম জীব রয়েছে যাদের চোখে দেখা না গেলেও এরা উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে রোগ লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই তখন মানুষের মনে প্রশ্ন উঠল তাহলে তামাক পাতায় যে রোগ দেখা দিয়েছে তার কারণ কি এমনই কোনো জীবাণু ? বিভিন্ন ঘরোয়া পদ্ধতি প্রয়োগ করে চাষীরা এই রোগের প্রতিকার সাধন করতে ব্যর্থ হলেন। এর মধ্যে প্রায় কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে। ডাচ চাষীরা এবার মধ্য-পশ্চিম নেদারল্যান্ডের জার্মান সীমান্ত সংলগ্ন ছোট্ট শহর Wageningen-এর নবস্থাপিত Agricultural School in Wageningen Agricultural Experiment Station এর অধিকর্তা অ্যাডল্ফ মায়ারের (Adolf Mayer) শরণাপন্ন হন। এই বিশিষ্ট জার্মান কৃষি-রসায়নবিদ্ উদ্ভিদের বিভিন্ন রোগ ও অস্বাভাবিকতা নিয়ে গবেষণা করতেন। চাষীদের অনুরোধে বিজ্ঞানী মায়ার তামাক গাছের এই অদ্ভূত রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। প্রথমেই তাঁর মনে আসে কোনো রোগসৃষ্টিকারী আণুবিক্ষণিক জীবাণুর কথা। কিন্তু ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীরা আলুর ধ্বসা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের রেণুকে খালি চোখে দেখতে না পেলেও এই ছত্রাকের রেণুস্থলীকে (sporangiosphore) আক্রান্ত পাতা এবং কান্ডের গায়ে লেগে থাকতে দেখেছিলেন। তাছাড়া রোগসংক্রমণের পরবর্তী পর্যায়ে ছত্রাকের সাদা রঙের মাইসেলিয়াম বা অণুদেহও খালি চোখেই দেখা যেত। কিন্তু তামাক পাতায় হলদে রঙের ছিটে দাগ দেখা গেলেও বা পাতা কুঁকড়ে গেলেও তাতে রোগ সংক্রমণের কোনো প্রত্যক্ষ চিহ্ন সেকালের যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় নি। ইতিমধ্যে আর এক রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ব্যাক্টেরিয়া সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা অনেকটা জানতে পেরেছিলেন। বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কচ্ ১৮৮২ সালে প্রমাণ করেন যে মানুষের দেহে টিউবারকিউলোসিস রোগের জন্য দায়ী এক রকমের ব্যাক্টেরিয়া। বিভিন্ন রকম ব্যাক্টেরিয়া কীভাবে জীবদেহে রোগ সংক্রমণ ঘটায় তিনি তারও বর্ণনা দেন, যা বৈজ্ঞানিক মহলে Koch's postulates নামে জনপ্রিয় হয়। এতে কোনো রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবকে কীভাবে পৃথক করে রোগ সংক্রমণের কারণ খুঁজে বার করা যায় তার বর্ণনা ছিল। স্বভাবতঃই রবার্ট কচের এই আবিস্কার বিজ্ঞানীমহলে সাড়া ফেলে দেয়। ইতিমধ্যে অ্যাডল্ফ মায়ারের গবেষণাও বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। ১৮৮৬ সালে মায়ার একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং তাতে তামাক গাছের এই অজানা রোগ লক্ষ্মণের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। যেহেতু এই রোগে গাছের কচি পাতা কুঁকড়ে যায় এবং পাতায় হলুদ বা গাঢ় সবুজ রঙের ছোপ পরে তাই তিনি এই রোগের নামকরণ করেন Mosaic diseases of tobacco।এছাড়া তিনি এও প্রমাণ করেন যে আক্রান্ত পাতার রস সুস্থ গাছের দেহে প্রবেশ করালে সুস্থ গাছেও রোগ সংক্রমণ ঘটছে এবং রোগ লক্ষ্মণ প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে আক্রান্ত গাছের পাতার রস নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করে দেখেন যদি এতে ছত্রাক বা ব্যাক্টেরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। বহুবার চেষ্টা করেও তিনি রোগ সংক্রামক অণুজীবের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন নি। রবার্ট কচের পদাঙ্ক অনুসরণ করেও তিনি আক্রান্ত উদ্ভিদে রোগ সংক্রামক কোনো ব্যাক্টেরিয়াকে পৃথক করতে সক্ষম হন না। তিনি ফিল্টার পেপারের মাধ্যমে আক্রান্ত উদ্ভিদের দেহরসকে বার বার পরিস্রুত করেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁকে নিরাশ হতে হয় স্বচ্ছ পরিস্রুত তরল (clear filtrate) পেয়ে। কোনো ব্যাক্টেরিয়া বা ছত্রাকের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তিনি পারেন নি যদিও কিন্তু তাঁর সন্দেহ হয় কোনো নতুন ধরনের, অণুজীব-ক্ষরিত কোনো গৌণ বিপাকীয় পদার্থ বা কোনো toxin অর্থাৎ বিষ এই রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী। পরবর্তী সময়ে তিনি একে বর্ণনা করেছিলেন, 'soluble enzymelike infectious principle was involved.' তাঁর এই গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ হতেই ইউরোপের বিজ্ঞানী মহল নড়ে চড়ে বসে। এদিকে এই রোগ সংক্রমণে নেদারল্যান্ডে তামাক চাষ প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। ক্রমে ক্রমে ইউরোপের যে সব পার্শ্ববর্তী দেশে তামাক চাষ হত সেখানেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

(খ) আলোর সন্ধান
অতিক্ষুদ্র কোনো ব্যাক্টেরিয়াম নাকি পরিস্রাবন-যোগ্য কোনো সংক্রামক বস্তু?

ইতিমধ্যে তামাক গাছের মোজাইক রোগের কারণ অনুসন্ধানে এগিয়ে আসেন এক তরুণ রাশিয়ান উদ্ভিদবিজ্ঞানী দিমিত্রি ইভানোভ্স্কি (Dmitri Ivanovsky)। সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশিষ্ট গবেষক ইউক্রেন আর তার সন্নিহিত অঞ্চলে তামাক গাছের মোজাইক রোগের কারণ অনুসন্ধানে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণা প্রণালী তাঁর পূর্বসুরীদের তুলনায় বেশ খানিকটা পৃথক ছিল। কয়েক বছর আগেই, ১৮৮৪ সালে ফরাসী অণুজীববিজ্ঞানী চার্লস চেম্বারল্যান্ড (Charles Chamberland) আবিষ্কার করেন অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত এক অনবদ্য পোর্সেলিনের ফিল্টার যা ব্যাক্টেরিয়াকে পরিস্রুত করতে পারে। আজকালকার দিনে এই ফিল্টার "চেম্বারল্যান্ড ফিল্টার" নামে পরিচিত। এতে মোমবাতির



চার্লস চেম্বারল্যান্ড ও তার ফিল্টার

মত আকারের কিছু চোঙাকৃতি অংশ থাকত যাতে ০.১ থেকে ১.০ মাইক্রন (১০০-১০০০ ন্যানোমিটার) ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত ছাঁকনি থাকত। এর সাহায্যে কোনো তরল মিশ্রণ থেকে ব্যাক্টেরিয়া বা ক্ষুদ্রাকৃতি অন্য কোনো জীবকোষকে পৃথক করা সম্ভব ছিল। এর ফিল্টারের মাধ্যমে পরিস্রুত তরলকে তাই জীবাণুমুক্ত বলে মনে করা হত। এই ফিল্টার ব্যবহার করে তামাক পাতার রোগের অণুজীবকে পৃথক করা সম্ভব; এই ধারণা ইভানোভ্স্কির মনে জন্মায়। তিনি যখন কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী পূর্ব ইউরোপের Crimera অঞ্চলে তামাকের এই মোজাইক রোগ নিয়ে

গবেষণা করছেন (১৮৮৭) তখন এক নতুন গবেষণা পদ্ধতি তাঁর মাথায় আসে। তিনি আক্রান্ত উদ্ভিদের দেহরসকে রঞ্জিত করে এই চেম্বারল্যান্ড ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে চালনা করেন এবং পরিস্রুত উদ্ভিদ রসকে সুস্থ তামাক পাতায় প্রবেশ করিয়ে দেখেন তা কুঁকড়ে গিয়ে তাতে হলদে ছোপ ধরছে। অর্থাৎ ঐ পরিস্রুত তরলে রোগ সংক্রামক অণুজীব বর্তমান। শুধু তাই নয়, এই পরীক্ষা থেকে তিনি এ সিদ্ধান্তেও আসেন যে ঐ সংক্রামক অণুজীবের আকার ব্যাক্টেরিয়ার থেকেও ছোটো। তিনি নিজেই তাঁর গবেষণার ফলকে বিশ্বাস করতে পারেন না, কারণ সেই সময় ব্যাক্টেরিয়াকেই সবচেয়ে ছোট অণুজীব বলে মনে করা হত। অধিকাংশ ছত্রাকের আকার বেশ বড়, অনেকসময় তা খালি চোখে দেখা যায়। তাই এই অজানা বস্তু ছত্রাক হতে পারে না। তাহলে এটি কী? তাঁর মনে সন্দেহ জন্মায় এই চেম্বারল্যান্ড ফিল্টারে হয়তো কোনো ফাটল আছে যেখান দিয়ে চুঁইয়ে ব্যাক্টেরিয়া এসে পরিস্রুত তরলে মিশছে। কিন্তু পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি তাঁর এই সন্দেহকে অমূলক বলে প্রমাণ করে। ১৮৯২ সালে তিনি তাঁর এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের ফলাফল প্রকাশ করেন। তিনি এও সন্দেহ করেন যে হয়তো অতি ক্ষুদ্রাকৃতির কোনো অচেনা ব্যাক্টেরিয়া চেম্বারল্যান্ডের ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। ১৮৯২ সালের এই গবেষণা বৈজ্ঞানিক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলে কারণ ব্যাক্টেরিয়ার থেকেও সূক্ষ্ম কোনো রোগ সংক্রামক বস্তুর অস্তিত্ব তখনকার বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা ছিল। এর প্রায় ১০ বছর পর তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফলকে একটি dissertation এর আকারে প্রকাশ করেন এবং তাতে তামাক গাছের মোজাইক রোগের কারণ হিসেবে কোনো নতুন প্রজাতির অতি ক্ষুদ্র ব্যাক্টেরিয়া বা ব্যাক্টেরিয়া থেকে নির্গত কোনো গৌণ বিপাকজাত পদার্থ বা toxin কে দায়ী করেন। কিন্তু বলাই বাহুল্য রোগ সংক্রামক বস্তুকে পৃথক করে সনাক্তকরণের কাজ তিনি করতে পারেন নি।



মারটিনাস বেইজেরিংক

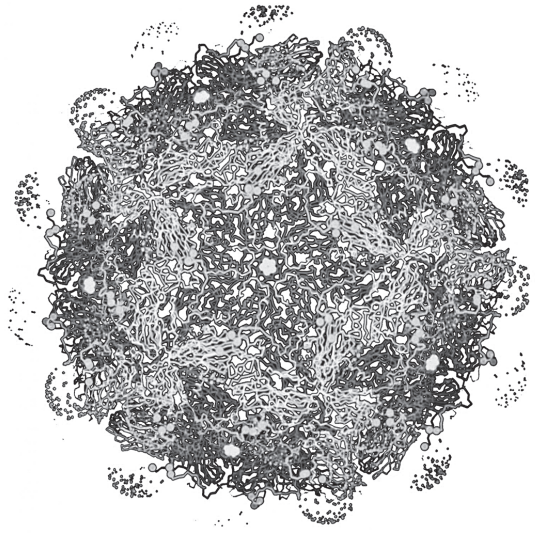
প্রায় একই সময়ে তামাক পাতার মোজাইক রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালাচ্ছিলেন আরেকজন ডাচ অণুজীব বিজ্ঞানী মারটিনাস বেইজেরিংক (Martinus Beijerinck)। তিনি ছিলেন Wageningen-এর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের গবেষক ও শিক্ষক এবং অ্যাডল্ফ মায়ারের যোগ্য উত্তরসূরী। মায়ার তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তারা দুজনে মিলে একটি স্থানীয় ''Natural Science Society'' স্থাপন করেন। মায়ার সাগ্রহে তাঁর গবেষণালবদ্ধ ফলাফল তাঁর অনুজ-প্রতিম বন্ধুকে জানান। মায়ারের গবেষণা পদ্ধতি বেইজেরিংককে অত্যন্ত প্রভাবিত করলেও ইভানোভ্স্কির পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত তাঁকে খুশী করতে পারেনি। ১৮৯৫ সালে বেইজেরিংক দক্ষিণ নেদারল্যান্ডের ডেলফ্ট (Delft) শহরের Technical University of Delfté-এ অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এই নতুন কর্মস্থলে যোগ দেবার কয়েক বছরের মধ্যেই তামাক গাছের মোজাইক রোগ নিয়ে তাঁর গবেষণা বিশেষ সাফল্য লাভ করে। তিনিই প্রথম ব্যাক্টেরিয়ার থেকেও ক্ষুদ্রাকৃতি কোনো রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং তাঁর দুই পূর্বসূরীদের মতন প্রায় একই রকমের পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। চেম্বারল্যান্ডের তৈরী ফিল্টারের সঙ্গে তিনি আগার (Agar) নামক একটি জিলাটিন জাতীয় পদার্থ, যা ব্যাক্টেরিয়ার আদর্শ কর্ষণ মাধ্যম (Culture medium) হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সংযুক্ত করেন যাতে ব্যক্টেরিয়া সংযুক্ত হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। পোর্সেলিন ফিল্টারের মাধ্যমে পরিস্রুত করা আক্রান্ত উদ্ভিদের দেহরসকে যখন তিনি এই আগার মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে চালনা করেন তখন ব্যাক্টেরিয়ার কোনো উপস্থিতি চোখে পড়ে না। অথচ এই পুনঃপরিস্রুত উদ্ভিদ রসকে কচি পাতায় প্রবেশ করালে তাতে রোগ লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়। এতে তিনি নিশ্চিন্ত হন যে এই রোগ সংক্রামক বস্তু আর যাই হোক ব্যাক্টেরিয়া নয়, কারণ ব্যাক্টেরিয়া হলে তা যত ছোটই হোক না কেন তা আগার ফিল্টারে আটকে যেত এবং তার অস্তিত্ব প্রমাণ হত। এছাড়া তিনি এও লক্ষ্য করেন যে এই নতুন সংক্রামক বস্তু রোগ সংক্রমণের জন্য পোষক কোষের উপর নির্ভরশীল। এই বস্তুকে পরিণত তামাক পাতার স্থায়ী কলায় প্রবেশ করালে তা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না। তামাক পাতার ভাজক কলার কোষে থাকলেই তা অতি দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং রোগ লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়। বেইজেরিংক তাঁর এই অত্যাশচর্য্য পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন ১৮৯৮ সালে এবং এই পরস্রুত রোগ সংক্রামক তরলের নামকরণ করেন 'Contagium Vivum Fluidum' অর্থাৎ 'রোগ সংক্রমণ সৃষ্টিকারী জীবন্ত তরল'। ল্যাটিন ভাষার এই বৈজ্ঞানিক শব্দগুচ্ছের সংক্ষিপ্ত হিসেবে তিনি 'Virus' শব্দটি ব্যবহার করেন যার অর্থ (ল্যাটিন ভাষায়) 'তরল বিষ'। একে তিনি সম্পূর্ণ নতুন রোগ সংক্রামক বস্তু হিসেবে অভিহিত করেন।

যদিও বেইজেরিংক ভাইরাসকে 'তরল বস্তু' বলে ভেবেছিলেন কিন্তু এ কথা সত্যি যে তিনিই প্রথম ব্যাক্টেরিয়া এবং ছত্রাক ছাড়া অপর কোনো রোগ সংক্রামক বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। যেহেতু সেই যুগে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের (ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ কোনো বস্তুর ১,০০,০০০ গুণ বিবর্ধিত চিত্র তুলে ধরতে পারে, যেখানে পূর্ববর্তী যুগে উপলব্ধ যৌগিক মাইক্রোস্কোপ কোনো বস্তুর ১,০০০ গুণ বিবর্ধিত চিত্র দেয়) আবিস্কার হয় নি, তাই ভাইরাসকে চাক্ষুস করা তৎকালীন বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই একদিকে যেমন বেইজেরিংকের এই আবিষ্কার আলোড়ন তোলে, অপর দিকে অনেক বিজ্ঞানীরা তাঁর এই আবিষ্কার নিয়ে সন্দিহান হন। সে সময় রোগ সংক্রামক বস্তু সম্পর্কে মানুষের যা ধারণা ছিল তাতে বেইজেরিংকের এই অকোষীয় তরল রোগ সংক্রামক বস্তুর অস্তিত্বকে অবান্তর বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এ দিকে তামাক পাতায় মোজাইক রোগের কারণ হিসেবে ব্যাক্টেরিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইভানোভ্স্কি নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেইজেরিংকের

এই আবিস্কারকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'that the entire problem will be solved without such a bold hypothesis'। যদিও ইভানোভ্স্কির এতো ক্ষোভের আরকটা কারণ ছিল। বেইজেরিংক তাঁর গবেষণাপত্রে ইভানোভ্স্কির গবেষণার কথা উল্লেখ করেন নি। তবু একথা সত্য যে আধুনিক অণুজীববিজ্ঞানীরা মারটিনাস বেইজেরিংকেই আধুনিক Virology বা ভাইরাস সংক্রান্ত বিজ্ঞান এবং গবেষণার পথিকৃৎ বলে মনে করেন।

(গ) ধ্বংসলীলা
প্রাণনাশী রোগসংক্রমণে ভাইরাসের ভূমিকা

বিজ্ঞান অনেকটা খরস্রোতা নদীর মতন, সুযোগ্য বিজ্ঞান সাধকের সার্থক তত্ত্বাবধানে তা গতিপথের সমস্ত বাধা-প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অজানা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলে। ইউরোপের উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা যখন এই নতুন সংক্রামক বস্তুর অস্তিত্ব নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছেন না তখন পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে এই রকম অনেক সংক্রমণের খবর পাওয়া যায় যেখানে সংক্রামক বস্তু ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধী ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। যে বছর বেইজেরিংক তাঁর গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করেন, অর্থাৎ ১৮৯৮-এ, রবার্ট কচের দুই সুযোগ্য ছাত্র ফ্রেডেরিক লোয়েফলার (Friedrich Loeffler) এবং পল ফ্রস (Paul Frosch) প্রথম গবাদি পশুর Foot and mouth disease এর রোগ সংক্রামক হিসেবে এমন এক রোগ সংক্রামক বস্তুর বর্ণনা দেন যারা পোর্সেলিন ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একেই বলা যেতে পারে প্রথম আবিষ্কৃত প্রাণী ভাইরাস, যদিও বেইজেরিংক ছাড়া কেউই এই সকল বস্তুকে "ভাইরাস" বলে চিহ্নিত করেন নি। যদিও



এফ এম ডি ভাইরাস

১৮৯৮ সালে লোয়েফলার এবং ফ্রস Foot and mouth disease research commission-এর প্রধান হিসেবে Prussian Ministry of Culture-কে পাঠানো এক রিপোর্টে এই রোগ সংক্রামক বস্তুকে 'Ultravisible–ultrafilterable substance' বলে বর্ণনা করেন এবং এও জোর দিয়ে বলেন যে এই সংক্রামক বস্তু কোনো ব্যাক্টেরিয়া-নিসৃত টক্সিন নয়। রোগাক্রান্ত গবাদি পশুর আক্রান্ত দেহাংশ থেকে সংগ্রহ করা দেহ তরলকে (vesicular extract) পরিস্রুত করে একের পর এক সুস্থ পশুর শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেখেন যে প্রতিক্ষেত্রেই তারা রোগাক্রন্ত



ফ্রেডেরিক লোয়েফলার

হয় এবং সেই রোগাক্রান্ত পশুর vesicular fluid বার বার রোগ সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হয়। গবেষণালব্ধ ফলকে জটিল গাণিতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সংক্রমণের কারণ কোনো ব্যাক্টেরিয়া ক্ষরিত টক্সিন নয়। কারণ বহুসংখ্যক প্রাণীদের মধ্যে একজন থেকে অন্যজনে সংক্রমণ ছড়ানোর পরে আক্রান্ত প্রাণীর শরীরে এই টক্সিনের পরিমাণ এতই কম হত যে 'A toxic effect of that nature would be unbelievable'। তাছাড়া এক পশু থেকে অন্য পশুতে সংক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও রোগের তীব্রতা না কমায় তাঁরা এ কথা জোর দিয়ে বলেন যে সংক্রামক বস্তুর প্রকৃতি তরল নয়, বরং এমন এক অতি ক্ষুদ্র কণা যা আক্রান্ত পশুর শরীরে গিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। এই গবেষকদ্বয় "ভাইরাস" শব্দটি ব্যবহার না করলেও পরবর্তীকালের অনেক বিজ্ঞানীই লোয়েফলার এবং ফ্রসকে ভাইরাসের প্রকৃত আবিস্কারক বলে বিবেচনা করেন। শুধু তাই নয় এই লোয়েফলার এবং ফ্রস গরু এবং ভেড়ার থেকে সংগ্রহ করা পরিসুত দেহতরলকে তাপ প্রয়োগে তার সংক্রমণ ক্ষমতা নষ্ট করে Foot and mouth disease-এর প্রতিষেধক টীকা হিসেবে সফলভাবে তার প্রয়োগ করেন। ভাইরাসকে সংক্রমণ-ক্ষমতাহীন (inactivated) অবস্থায় প্রতিষেধক টীকা রূপে এই প্রথম ব্যবহার করা হয়। ভাইরাস আবিষ্কার সংক্রান্ত এই গবেষণা যে কেবল ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, উত্তাল আটলান্টিক সাগর পেরিয়ে তার ঢেউ এসে পৌঁছায় দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়েতে। অণুজীববিজ্ঞানী গিউসেপ্পে সানারেল্লি Giuseppe Sanarelli ১৮৯৬ সালে মন্টেভিদিওতে (Montevideo) তাঁর গবেষণাগারে ইউরোপীয়ান খরগোশের (*Oryctolagus cuniculus*) শরীরে Myxomatosis (এটি খরগোশের একটি সংক্রামক রোগ, এতে খরগোশের চোখে মিউকাস পর্দা ফুলে যায় এবং পাশ দিয়ে জলীয় ক্ষরণ হয়।) রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুকে ভাইরাস বলে বর্ণনা করেন। সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা যেখনে পৃথকীকরণের জন্য পরিস্রাবণ পদ্ধতির সাহায্য নেন, সেখানে তিনি সংক্রামক বস্তুকে পৃথক করতে centrifugation-এর সাহায্য নিয়েছিলেন। যদিও তাঁর এই আবিষ্কার প্রথম 'Foot and Mouth Disease' (FMD) সৃষ্টিকারী ভাইরাসের মতন প্রথম প্রাণীভাইরাসের স্বীকৃতির দাবিদার, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসকে প্রথম বর্ণিত প্রানী ভাইরাসের স্বীকৃতি দেন নি।

মানুষের শরীরে সংক্রমণ সৃষ্টিকারী প্রথম ভাইরাসের নিদর্শন পাওয়া

যায় কিউবায় yellow fever virus-এর ক্ষেত্রে। আজ বিজ্ঞানীরা জানেন এই রোগের সংক্রামক বস্তু এক বিশেষ ধরনের ভাইরাস (Yellow Fever Virus)। মানুষের শরীরে সংক্রমণের ক্ষেত্রে *Aedes aegypti* মশা এই ভাইরাসের ভেক্টর (এমন এক জীবজ বাহক যার শরীরে পরজীবি বা সংক্রামক জীবাণুর জীবন চক্রের কোনো একটি দশা অতিবাহিত হয় ; অর্থাৎ রোগ সংক্রমণের জন্য এই বাহক অতি আবশ্যক) হিসেবে কাজ করে। এই রোগ সম্ভবত আফ্রিকায় উদ্ভুত হয়, তারপর মশার বিস্তারের সাথে সাথে তা আমেরিকা মহাদেশ এবং তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় এই রোগের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা বা প্রতিষেধক টীকা না থাকায় তা বীভৎস রূপ ধারণ করে। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসেও এর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়েছিল। হাইতিতে ফরাসী সেনাবাহিনী যখন ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ দমন করতে যায় তখন তাদের একটা বড় অংশ এই রোগের শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করে। পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিকরা ধারণা করেছেন ১৮০৪ সালে ফরাসী শাসন থেকে মুক্তি লাভ করার ব্যাপারে এই ঘটনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যাইহোক, ১৮৮১ সালে কিউবার চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী কার্লোস ফিনলে (Carlos Finlay) প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করে বলেন যে এই Yellow Fever-এর সংক্রামক জীবাণুর বাহক হল মশা। তবে সংক্রামক বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। এরপর ১৮৯০-এর দশকে শুরু হয় স্পেন ও আমেরিকার যুদ্ধ। কিন্তু আমেরিকার সরকার দেখেন যত সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করছেন তার প্রায় ১৩ গুণ সৈন্য এই প্রাণঘাতী রোগের কবলে পড়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। এই ঘটনাকে আমেরিকার সরকার যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন এবং আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসক ও গবেষকদের নিয়ে একটি মেডিকেল কমিশন গঠন করেন যার প্রধান ছিলেন ওয়াল্টার রীড (Walter Reed)। এই বিশিষ্ট আমেরিকান বিজ্ঞানী তাঁর পূর্বসূরী ফিনলের গবেষণালব্ধ ফলকে নিয়ে এই রোগের সংক্রামক বস্তুর প্রকৃতি অন্বেষণে সচেষ্ট হন। তিনি দেখেন যে মশা-বাহিত এই রোগের জীবাণুও এতটাই ছোটো যে তা পোর্সেলিন ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। রীড একেও filterable agent বলে ব্যাখ্যা করেন। আক্রান্ত মানুষের সিরাম (রক্ত তঞ্চনের পরবর্তী হলুদ রঙের তরল) পরিস্রুত করে সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করালে সুস্থ মানুষের শরীরেও যে রোগ সংক্রমণ হয় তাও এই গবেষকদল প্রমাণ করেন। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এও পরিস্কার হয় যে মশক নিবারণ করতে পারলে এই রোগের বিধ্বংসী প্রভাব অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এরপর ১৯০১ এবং ১৯০২ সালে আমেরিকান সেনা বাহিনীর বিশিষ্ট চিকিৎসক ও US Army 22nd Surgeon General উইলিয়াম ক্রাউফর্ড জর্গাস (William Crauford Gorgas) কিউবায় মশক প্রজনন স্থল ধ্বংস করে মশক নিবারণে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। ফলস্বরূপ এই অঞ্চলে প্রাণঘাতী ইয়েলো ফিবারের ব্যাপকতাও অনেকটাই কমে যায়। এ দিকে আমেরিকায় সে সময় পানামা খালের খনন কার্য চলছে। কিন্তু দেখা যায় ইয়েলো ফিবারের এই জীবননাশী সংক্রমণের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক মৃত্যুভয় দেখা দেওয়ায় এই খাল খনন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছুতেই শেষ করা যাচ্ছে না। আমিরিকান সরকারের নির্দেশে ডঃ জর্গাস পানামা খাল সংলগ্ন অঞ্চলে মশক নিয়ন্ত্রনের কাজ দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করেন। ফলস্বরূপ ১৯১৪ সালে পানামা খালে নৌকা চলাচল শুরু হয় যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্ময় পণ্য ও সেনা সামগ্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে এবং পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বানিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও ইয়েলো ফিবারের প্রকৃত সংক্রামক ভাইরাসের পরিচয় পেতে পৃথিবীকে আরো তিন দশক অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৩২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা-জাত আমেরিকান নাগরিক ও বিশিষ্ট অণুজীববিজ্ঞানী ম্যাক্স থেইলার (Max Theiler) প্রথম ইয়েলো ফিবার ভাইরাসকে পৃথক করে সনাক্ত করেন। নিউইয়র্কের Rockefeller Foundation-এর এই বিজ্ঞানী ১৯৩৭ সালে এই রোগের সফল প্রতিষেধক টীকাকরণ আবিষ্কার করেন। ফলস্বরূপ ১৯৫১ সালে তিনি নোবেল সম্মানে ভূষিত হন।


কার্লোস ফিনলে

এর পরবর্তী কয়েক বছরে আরো বেশ কিছু সংক্রামক রোগের পেছনে বিজ্ঞানীরা এই সংক্রামক বস্তুর ভূমিকা লক্ষ্য করেন। ব্যাক্টেরিয়ার চেয়েও আকারে ছোট এই filterable agent-এর স্বরূপও ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে শুরু করে। দেখা যায় বহু চেষ্টা করেও আগার (agar) জাতীয় কর্ষণ মাধ্যমে (culture medium) এই সংক্রামক বস্তুকে কৃত্রিমভাবে কর্ষণ (culture) করা সম্ভব হয় না। তাই এরা যে অজানা নতুন প্রজাতির কোনো অতি ক্ষুদ্র ব্যাক্টেরিয়াম এই ধারণা বিজ্ঞানীদের মনে যথেষ্ট প্রশ্নচিহ্নের সৃষ্টি করে। জীববিজ্ঞানের কিছু নতুন শাখা, যেমন, অণুজীববিদ্যা (Molecular Biology), অনাক্রম্যতাবিদ্যা (Immunology) এবং জৈবরসায়নের (Biochemistry) অভাবনীয় প্রগতির সাথে সাথে আরো কিছু সংক্রামক রোগের সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অবগত হন। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে আফ্রিকা এবং মধ্য এশিয়ার একটি বড় অংশের পশুপালকদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল Rinderpest বা গবাদি পশুর প্লেগ (Cattle plague) রোগ। অত্যন্ত সংক্রামক এই ব্যাধির ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে পরবর্তীকালে গবেষকরা বলেছিলেন, the worst animal disease known worldwide in terms of mortality। ১৮৮৭ সালে পূর্ব আফ্রিকায় (বর্তমানে যেখানে ইথিওপিয়ার অবস্থান), এশিয়া থেকে আমদানি করা গবাদি পশুর মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমণ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন। মাত্র দশ বছরের মধ্যেই তা মহামারীর আকারে পুরো আফ্রিকায় ছড়িয়ে পরে এবং প্রায় ৮০-৯০% গবাদি পশু এবং কিছু বন্য তৃণভোজী প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। সে সময় আফ্রিকান গ্রামীন অর্থনীতির প্রধান বুনিয়াদ ছিল এই পশুপালন। এই বিরাট সংখ্যক গবাদি পশুর মৃত্যুতে আফ্রিকার গ্রামীন অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ অনাহারে এবং অপুষ্টিতে মারা যায়। তৎকালীন অণুজীববিজ্ঞানীরা পরিচিত কোনো ব্যাক্টেরিয়া বা ছত্রাকের স্ট্রেনের সাথে এই রোগ সংক্রামক বস্তুর মিল খুঁজে পান নি। সে সময় বৈজ্ঞানিক মহলে এই ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায় যে এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার না হলে গবাদি পশুর এই মড়ক ঠেকানো যাবে না। সে সময় এই কাজে বড়সড় সাফল্য

পান সুইৎজারল্যান্ড জাত এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত বিশিষ্ট পশুচিকিৎসক ও বিজ্ঞানী স্যার আরনোল্ড থেইলার (Sir Arnold Theiler)। ১৮৯৭ সালের শেষভাগে তিনি প্রকৃতপক্ষে আক্রান্ত পশুর শরীর থেকে রক্তের সিরাম সংগ্রহ করে তার সঙ্গে রোগ সংক্রমণের পর সুস্থ হয়ে ওঠা কোনো পশুর সিরামকে মিশ্রিত করে সে মিশ্রণকে প্রতিষেধকে টীকা হিসেবে ব্যবহার করেন। Rinderpest-এর সংক্রামক বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলেও অত্যন্ত সরল (crude) পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা অপরিশোধিত টীকা দক্ষিণ আফ্রিকায় অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে এবং গবাদি পশুদের মধ্যে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরী হয়। অবশেষে ১৯০২ সালে তুর্কীর দুই অণুজীববিজ্ঞানী মরিস নিকোলে (Maurice Nicolle) এবং অ্যাডিল মুস্তাফা Adil Mustafa Rinderpest-এর সংক্রামক বস্তু হিসেবে এক নতুন ধরনের filterable agent-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ।

১৯০৩ সালে জলাতঙ্ক রোগের জন্য ফরাসী জীববিজ্ঞানী পল রেম্লিঙ্গার (Paul Remlinger) এবং রিফ্যাট বে (Riffat Bay) একই রকম এক সংক্রামক filterable agent-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ইতিপূর্বে ১৮৮৫ সালে বিশ্ববরেণ্য অণুজীবিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এমিল রক্সের (Emile Roux) সহযোগিতায় সংক্রমিত খরগোশের শুকনো সুসুম্নাকান্ডের নির্যাস থেকে জলাতঙ্ক রোগের টীকা আবিষ্কার করলেও এই রোগের কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পক্ষাঘাত সৃষ্টিকারী ভয়ঙ্কর এক সংক্রামক রোগ ইউরোপে শিশুদের বাবা মায়েদের মধ্যে প্রচন্ড এক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে Poliomyelities নামক ভয়াল এই রোগের চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় ১৭৮৯ সালে। যেখানে ইংরেজ চিকিৎসকরা একে বর্ণনা করেছেন, 'a debility of the lower extremities' বলে। আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছরেরও আগে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০৩ থেকে ১৩৬৫ অব্দের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে) প্রাচীন ইজিপ্সীয় হায়ারোগ্লিফিক চিত্রে পোলিও আক্রান্ত ব্যাক্তির বর্ণনা পাওয়া গেছে বলে গবেষকরা বিশ্বাস করেন। এই অসুখে শিশুরাই বেশী আক্রান্ত হলেও বড়রাও সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেত না। বিজ্ঞানীরা খেয়াল করেন যে পানীয় জলের সংক্রমণ থেকে সদ্যোজাত শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গরমের দিনে এই সংক্রমণ বাড়ত এবং শহরের পর শহর, যাকে বলে, উজাড় হয়ে যেত। যদিও শিশুরা প্রথম পোলিও সংক্রমণ কাটিয়ে উঠতে পারলেও প্রায় প্রত্যেকেই বাকি জীবনে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ত। সংক্রমণ তীব্রতর হলে মৃত্যুও খুব অস্বাভাবিক ছিল না। আর যাঁরা বেঁচে যেত অঙ্গহানী বা পঙ্গুত্বের অভিশাপ তাঁদের সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হত। ১৯০৯ সালে বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডষ্টেইনার (Karl Landsteiner) এবং আরউইন পপ্পার (Erwin Popper) সর্বপ্রথম এই রোগ সংক্রমণের জন্য পোলিও ভাইরাসকে দায়ী করেন। এই ভয়াল রোগের সংক্রামক বস্তু যে কোনো ভাইরাস (filterable agent) তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে বিজ্ঞানীদ্বয় এই রোগে সদ্য প্রাণ হারানো এক শিশুর সুসুম্নাকান্ডের অকোষীয় নির্যাস (cell free extract) পরিস্রুত করে বাঁদরের শরীরে প্রবেশ করান। দেখা যায় বাঁদরের শরীরে পোলিও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। মানুষের রোগবিস্তার এবং মাহামারীর ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে Poliomyelities-এর প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার হয় এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ এই রোগের অভিশাপকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রাণনাশী রোগ বিস্তারের কথা পর্যালোচনা করতে গেলে অবশ্যই উঠে আসবে ক্যান্সার বা কর্কট রোগের নাম। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ক্যান্সার হল শরীরের এমন এক রোগজনক অবস্থা যখন শরীরের কোনো বিশেষ অংশের কোষসমূহ অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ক্রমাগত বিভাজিত হতে শুরু করে এবং ক্রমশঃ একটি অনভিপ্রেত কোষপুঞ্জের আকার নেয় যা পরবর্তী সময়ে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে (প্রধানত রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে) অনভিপ্রেত কোষ বিভাজনের ফলস্বরূপ নতুন কোষপুঞ্জ গঠন করার ক্ষমতা রাখে। মানব সভ্যতার ইতিহাসের আদি পর্যায় থেকেই এই মারণ রোগের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এর প্রথম লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় আজ থেকে প্রায় ৩৬০০ বছর আগে লিখিত এক প্রাচীন মিশরীয় প্যাপিরাসে এডুইন স্মিথ প্যাপিরাস (Edwin Smith papirus) নামে পরিচিত। তবে মারণ রোগ ক্যান্সারের সাথে ভাইরাসের যোগসূত্র আবিষ্কার হয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে। আজ বিজ্ঞানীরা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এই বিশেষ ধরনের ভাইরাসকে 'অঙ্কভাইরাস' (oncovirus) বলে থাকেন। শুধুমাত্র মানুষের শরীরেই যে এই অঙ্কভাইরাস ক্যান্সার সৃষ্টি করে থাকে তা নয়, অনেক সময় 'না-মানুষ'দের শরীরেও নানা অঙ্কভাইরাস ক্যান্সার সৃষ্টি করে থাকে। ১৯০৮ সালে ইউনিভার্সিটি অফ্ কোপেনহেগেনের দুই কৃতী গবেষক ভিলহেম ইলারম্যান (Vilhelm Ellermann) এবং ওলাফ ব্যাং (Olaf Bang) Nonhuman oncovirus-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তারা avian cercoma leukosis জাতীয় বিশেষ ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত মুরগীর শরীর থেকে রোগ সংক্রামক বস্তুকে পরিস্রুত করে কোষহীন নির্যাস তৈরী করে তা সুস্থ মুরগীর শরীরে প্রবেশ করিয়ে লিউকোমিয়া (বিশেষ ধরনের ক্যান্সার যাখানে রক্তে শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে যায়) সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এরই দুই বছর পরে আমেরিকার রকফেলার ইউনিভার্সিটির পেয়েটন রস (Peyeton Rous) তাঁর ডেনমার্কের দুই পূর্বসূরীর গবেষণাকে পরিমার্জিত করে মুরগীর পেশী কোষের ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এক বিশেষ প্রকারের পরিস্রাবণযোগ্য সংক্রামক বস্তুর অস্তিত্ব বর্ণনা করেন যা বর্তমানে 'Rous sarcoma' বলে পরিচিত। তবে মানুষের শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী Human oncovirus-এর অস্তিত্ব জানা যায় এর বহু বছর পরে, ১৯৬৪ সালে। মানুষের নাসিকা তন্ত্রের এক বিশেষ ধরনের ক্যান্সারের (Burkitt Lymphoma) সংক্রামক বস্তু রূপে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীন অধ্যাপক মাইকেল এ্যান্টনি এপ্সটিন (Michael Anthony Epstein) এবং ইংল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ পিএইচডি গবেষক ইভোন বার (Yvonne Barr) এক বিশেষ প্রকারের ভাইরাসের অস্তিত্বের কথা নথিভুক্ত করেন যা পরবর্তীকালে আবিস্কারকদের নাম অনুযায়ী Epstin Barr Virus (EBV) নামে বিখ্যাত হয়।

লেখক ১. প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, গরুবাথান সরকারি কলেজ, কালিম্পং-৭৩৫২৩১, মো.-7076284998 ২. রসায়ন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান-৭১৩১০৪

email: rghosh@chem.bur.univ.ac.in • M. 8944830663

প্রচ্ছদ কথা ২

রা জ দী প ভ ট্টা চা র্য

মেঘনাদ সাহা—অনন্তের পথিক

ভাষাবিদ্ মহ: শহীদুল্লাহ 'পুণ্যস্মৃতি' শীর্ষক রচনায় লিখেছেন ১৯২০ সালের কিছু আগের একটি ঘটনা। স্থান আপার সার্কুলার রোডের সুবিশাল এক অট্টালিকা, যার একটি ছোট ঘরে থাকেন প্রফুল্লচন্দ্র, আর পাশের দুটি ঘরে তাঁর ছাত্ররা। সবে কলেজ থেকে ফিরে সবাই জামা-কাপড় ছাড়ছে। এমন সময়ে গোঙানী আর কাতরানির শব্দ। সহপাঠীরা তাকিয়ে দেখে ঢাকার জুবিলি স্কুল থেকে আসা নতুন ছাত্রটি আটকে গেছে নিজেরই জামার মধ্যে, চলছে ধস্তাধস্তি। সাহায্য তো দূরের কথা, ঘরে বসে বিনা পয়সায় এমন সার্কাস দেখে সবাই হেসে কুটোপাটি। ছুটে এলেন প্রফুল্লচন্দ্র। দেখে বুঝলেন ব্যাপার বেশ ঘোরালো। যে দর্জি জামা তৈরি করেছে সে বড় বোকা, সামনের দিকে কয়েকটি বোতাম লাগিয়ে রেখেছে। যতবার জামা খোলো আর পরো ততবার বোতাম খোলো আর লাগাও। এতসব কাজের কথা কি মনে রাখা সম্ভব। তাও এই বয়সে! আর সময়ই বা কোথায় এত। আচার্য শার্টের সামনের দিকের বোতামকয়টি খুলে পিঠ চাপড়ে সহাস্যে বললেন, 'আস্ত একটা দার্শনিক নিয়ে মুশকিলে পড়েছি।' এই 'দার্শনিক' ছাত্রটিই ভবিষ্যৎ জীবনের একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী, ভারতবর্ষের 'পরিকল্পনার জনক'।



১৮৯৩, ৩ অক্টোবর প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ঢাকা জেলার শ্যাওড়াতলী গ্রামে নিম্নবিত্ত পরিবারে এই বরেণ্য বাঙালির আবির্ভাব ঘটে। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে এই আগমন! ঝড়ের দাপটে উড়ে গিয়েছিল আঁতুরঘরের চাল। এহেন শিশুর নাম 'মেঘনাথ' ছাড়া আর কী হতে পারে! যদিও পরে তা একটু বদল করে হয় 'মেঘনাদ'।

গ্রামের বাজারে সামান্য মুদির দোকানী বাবা জগন্নাথ সাহা এবং মা গৃহকর্মে সদা ব্যস্ত ভুবনেশ্বরী দেবীর পঞ্চম সন্তান মেঘনাদ। ছোটবেলা থেকেই বাবার সাথে দোকানে বসতেন তিনি। বাবা চাইতেন ছেলে দোকানটাই ভালো করে সামলাক। একরকম জেদাজেদি করেই মেঘনাদ ভর্তি হল গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে।

প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষ হল। মাস্টারমশাইরা মেঘনাদের বাবাকে বললেন যে, এমন মেধাবী ছেলের অবশ্যই মিডল স্কুলে পড়া উচিত। তার বাবা নিজের আর্থিক অক্ষমতার কথা জানালেন। বড়দা জয়নাথ ভাই-এর লেখাপড়ার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু নিকটবর্তী মিডল স্কুলটি ছিল প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে শিমুলিয়া গ্রামে। অবশেষে শিমুলিয়ার ডাক্তার অনন্ত কুমার দাসের বাড়িতে মেঘনাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। বিনিময়ে তাঁকে বিভিন্ন ফাইফরমাস, গবাদি পশুর দেখাশুনা ইত্যাদি করতে হত। বারো বছর বয়সে মিডল পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগে প্রথম হয়ে বৃত্তি পেলেন মেঘনাদ। পরবর্তী স্তরে অর্থের দুশ্চিন্তা দূর হল। এই মিডল স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই শ্রী প্রসন্ন কুমার চক্রবর্তী সেই সময়ে মেঘনাদের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিলেন। তাঁর প্রেরণাতেই বালক মেঘনাদের মনে অঙ্ক বিষয়ে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল তা অনেকাংশে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পথরেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

মাসিক চার টাকা সরকারি বৃত্তি পাওয়া নিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু তা দিয়ে তো ঢাকায় থেকে পড়াশুনা করার প্রয়োজন সম্পূর্ণ হয় না। বড়দা জয়নাথ মাসিক পাঁচ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পূর্ববঙ্গ বৈশ্য সমিতি মাসিক দুটাকা সাহায্যের অঙ্গীকার করল। এভাবে মাসে মোট এগারো টাকা সম্বল নিয়ে ১৯০৫ সালে মেঘনাদ ভর্তি হল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। এ সময়ের লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলেন। শুরু হল বিরোধী আন্দোলন। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের ছোটলাট Bamfylde Fuller ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে এলেন। প্রতিবাদে ছাত্ররা হরতাল ডাকল, এতে সমর্থন করায় স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হল মেঘনাদকে, তাঁর বৃত্তি ও বিনা বেতনে পড়ার সুযোগও কেড়ে নিল সরকার। তবু পূর্বের পরীক্ষায় ভালো ফল ও দাদা জয়নাথের সাহচর্যে বিনা বেতনে স্টাইপেন্ড সহ ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলি স্কুলে পড়ার সুযোগ পেলেন মেঘনাদ। তিনি পরে অন্যত্র বলেছিলেন যে জুবিলি স্কুলের শিক্ষক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর মনকে বিজ্ঞানমুখী করে তুলেছিলেন। ১৯৩৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় (বর্তমান মাধ্যমিক) প্রথম হয়ে মেঘনাদ তাঁর বিদ্যালয়জীবন শেষ করলেন। তিনি ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক ও সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। ভর্তি হলেন ঢাকা কলেজে। ১৯১১ সালে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করলেন। উল্লেখ্য প্রথম হয়েছিলেন ভবিষ্যতের অপর বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ইন্টারমিডিয়েট স্তরে মেঘনাদের চতুর্থ বিষয় ছিল জার্মান ভাষা, যাতে নম্বর কম হওয়ায় মেঘনাদের দ্বিতীয় হওয়া। কিন্তু এই ভাষাশিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

কলকাতায় এসে অঙ্ক নিয়ে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেসময়ে শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখরা। আর সহপাঠীদের মধ্যে পরবর্তীকালে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, নিখিলরঞ্জন সেন,

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখরা। শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ তখন চাঁদের হাট। তিন শ্রেণি নীচে পাঠরত সুভাষচন্দ্রের সাথেও পরিচয় হয় মেঘনাদের। ১৯১৩ সালে গণিত অনার্স বিভাগে বি.এস.সি. পরীক্ষার ফল বেরুল। প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় মেঘনাদ। ১৯১৫ সালে এম.এস.সি. পরীক্ষা সম্পূর্ণ হল। মিশ্র গণিত বিভাগে প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ আর ফলিত গণিত বিভাগে প্রথম মেঘনাদ।



বাঁদিক থেকে (বসে) : মেঘনাদ সাহা, জগদীশচন্দ্র বোস, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।
বাঁদিক থেকে (দাঁড়িয়ে) : স্নেহময় দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, দেবেন্দ্রমোহন বোস, এন আর সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, এন সি নাগ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে মেঘনাদও ছিলেন তাঁর নিজের মত করে। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পুলিন দাস ও বাঘাযতীনের সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মেঘনাদ ছিলেন অনুশীলন সমিতির সভ্য। খবর এল জার্মানি থেকে বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আসছে সুন্দরবনে রায়মঙ্গলের তীরে। মেঘনাদ প্রস্তুত হলেন যাওয়ার জন্য। সে জাহাজ আর এলো না। তখনকার পুলিশের কাছে এসব খবর ছিল। ফলে সরকারি পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি মেঘনাদ পেলেন না। এদিকে ভাই কানাইলালের পড়াশুনার দায়িত্ব নিতে হল তাঁকে। এই অনিশ্চিত জীবনে টিউশনি করে উপার্জন করতে হত মেঘনাদকে। এ সময়ে 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি নিজের দক্ষতায় ভারতীয় দানবীরদের সহায়তায় গড়ে তুলেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিজ্ঞান কলেজ। ১৯১৬ সালে স্যার আশুতোষের ডাকে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক রূপে সেখানে যোগ দিলেন মেঘনাদ। শুরু হল তাঁর কর্মজীবন।

এই সময়ে মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথের একটি মৌলিক প্রবন্ধ (যা 'সাহা-বোস সমীকরণ' নামে পরিচিত) প্রকাশ পেল ইউরোপের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে। ১৯১৮ সালে মেঘনাদ পেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস.সি. উপাধি আর ১৯১৯ সালে ''On a Physical Theory of Stellar Spectra'' শীর্ষক নিবন্ধের জন্য লাভ করলেন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি। অতঃপর ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উচ্চতর গবেষণার উদ্দেশ্যে মেঘনাদ ইউরোপ যাত্রা করলেন।

১৯১৮ সালে জুন মাসে রাধারানী রায়-এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন মেঘনাদ। সারাজীবন এই রমণী তাঁর সংসারের যাবতীয় দায় যথাযথভাবে নির্বাহ করেন। ছেলে অজিত, রণজিৎ ও প্রসেনজিৎ এবং মেয়ে ঊষা, চিত্রা ও কৃষ্ণার বড় হওয়া, পড়াশুনা ইত্যাদি রাধারানীর সচেতন সাহচর্যেই সম্ভব হয়েছিল।

মেঘনাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইউরোপ পৌঁছে আধুনিক ল্যাবরেটরিতে উন্নত বৈজ্ঞানিক পরিবেশের সাথে নিজেকে পরিচিত করা। এই সময়ে মেঘনাদের ''On Ionization in the Solar Chromosphere'' শীর্ষক একটি রচনা ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হওয়ায় ইউরোপের বিজ্ঞানী সমাজে মেঘনাদের পরিচিতি বাড়ে। ভারতে বসে নিজ ধারণা অনুযায়ী এই প্রবন্ধে মেঘনাদ একত্রে আয়ণিত পরমাণুর উপস্থিতি, অবস্থান, গাণিতিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি যেভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন পরবর্তীকালে পর্যবেক্ষকদের অভিজ্ঞতার সাথে তা মিলে যায়। লন্ডনে বিজ্ঞানী ফাউলার-এর অধীনে পাঁচমাস ও বার্লিনে রাসায়নিক পদার্থবিদ নার্নস্ট-এর কাছে প্রায় এক বছর মেঘনাদ গবেষণা করেন। জার্মানিতে থাকাকালীন প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, রুবেন্স, এগার্ট প্রমুখ বিজ্ঞানীর সাথে তিনি পরিচিত হন। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন জার্মানির মিউনিকে। মেঘনাদ তাঁর সাথে সাক্ষাতে এলে কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানান। ১৯২১ সালে স্যার আশুতোষের ডাকে মেঘনাদ ফিরলেন কলকাতায়, খয়রা অধ্যাপক রূপে যোগ দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলকাতায় তখন হাতেকলমে কাজ করার মত ল্যাবরেটরির বড় অভাব। তাই ১৯২৪ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন মেঘনাদ। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি যুক্ত ছিলেন এখানে। তাঁর ভাষায় ''এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কয়েক বছর আমার যেন নির্জন দ্বীপে রবিনসন ক্রুসোর অবস্থা হয়েছিল।'' কিন্তু মেঘনাদের তীক্ষ্ণধী ও প্রবল উদ্যমে ধীরে ধীরে উত্তর ভারতে তরুণ বিজ্ঞানীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। ক্লাস নেওয়া ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া দুটো কাজই মেঘনাদ করতেন দক্ষতার সঙ্গে। শিক্ষক মেঘনাদ বিশ্বাস করতেন টমাস আলভা এডিসনের সেই উক্তি—''Success in research is only two percent inspiration and ninety eight percent perspiration.'' ১৯২৭ সালে মেঘনাদ হলেন রয়্যাল সোসাইটির সদস্য (F.R.S.)। ১৯৩৪ সালে তিনি হন নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি। সভাপতির ভাষণে তিনি প্রথম নদীউপত্যকা উন্নয়ন এবং ভারতে উদকবিদ্যা বিকাশের উদ্দেশ্যে গবেষণাগার স্থাপনের কথা বলেন। এলাহাবাদে থাকাকালীন মেঘনাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল 'উত্তরপ্রদেশ আকাদেমি অব সায়েন্স' স্থাপন। পরে এর নাম হয় 'দি ন্যাশনাল আকাদেমি অব সায়েন্স'। এর উদ্বোধন হয় ১৯৩২ সালে।

১৯২৭ সালে মেঘনাদ সাহা দ্বিতীয়বার ইউরোপ যান। এ সময়ে বিদ্যুতের আবিষ্কর্তা আলেসান্দ্রো ভোল্টার মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে ইটালিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ কার্নেগিট্রাস্ট প্রদত্ত ফেলোশিপের টাকায় তৃতীয়বার ইউরোপ ও সাথে আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ পান মেঘনাদ, জার্মানির মিউনিকে তিনি বিপুল সম্বর্ধনা পান। USA-তে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে মেঘনাদ মহাকাশে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা সকলকে জানান। সান ফ্রান্সিসকোতে অধ্যাপক লরেন্সের সাইক্লোট্রোন ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই অভিজ্ঞতা ভারতে সাইক্লোট্রোন যন্ত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে কাজে লেগেছিল। ফেরার পথে পুনরায় ইউরোপের কোপেনহেগেনে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং পদার্থবিজ্ঞানের এই শাখার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতিনিধিদলের সদস্য রূপে মেঘনাদ সাহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বিষয়ে সেই দেশের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে। কিন্তু সেদেশে গোপনীয়তার মোড়ক ভাঙতে তাঁরা বিশেষ সফল হননি। ১৯২৭ সালে শেষবার তিনি ইউরোপের প্যারিসে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের উদ্দেশ্যে আয়োজিত স্মরণসভায়। এ সময়ে তিনি ফ্রান্স থেকে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।



এলাহাবাদে দীর্ঘ কর্মজীবন কাটিয়ে ১৯৩৮ সালে মেঘনাদ সাহা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। এ সময়ে তাঁর মনে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সম্পর্কে গভীর আকর্ষণ। তাই কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে একটি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাবরেটরি গড়ে তুলতে মনস্থ করেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রয়োজন বিপুল অর্থের। ১৯৩৯ ও ৪১ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কাজে তিনি যখন মুম্বাইতে তখন জওহরলাল নেহেরুকে এ বিষয়ে অবগত করেন। নেহেরুজীর পরামর্শক্রমে জে.আর.ডি. টাটাকে অনুরোধ জানানো হলে তিনি সাইক্লোট্রোন যন্ত্র বসাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ষাট হাজার টাকা সাহায্য করেন। এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে মেঘনাদ সাহা তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু করলেন। পরবর্তীকালে 'ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যখন একটি সর্বভারতীয় স্বাধীন ব্যবস্থা রূপে কাজ শুরু করে তখন এর প্রকৃত উন্নতি শুরু হয়। উল্লেখ্য মেঘনাদ সাহার মৃত্যুর পর এই সংস্থার নাম হয় 'সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'। পরমাণুশক্তি সংক্রান্ত গবেষণার উদ্দেশ্যে 'সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' নামক সংস্থার প্রতিষ্ঠাই হল মেঘনাদ সাহার জীবনের সর্বোচ্চ মাইলস্টোন।

বাঙালি তথা ভারতবাসীর মনে বিজ্ঞানচর্চার জোয়ার আনতে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬ সালে 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মেঘনাদ ছাত্রজীবন থেকেই এখানে আসতেন এবং ১৯২৬ সাল থেকে এর আজীবন সদস্য হন। তাই ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার পর তিনি ঘনিষ্ঠভাবে এই সংস্থার কাজে যুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে এর সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৪৬ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন। মেঘনাদের চিন্তা ও উদ্যোগে যাদবপুরে বিস্তৃত ভূখন্ডে নবনির্মিত ভবনে এর স্থানান্তর ঘটে ও সরকারি অনুদান বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মেঘনাদ সাহা রচিত দুটি গ্রন্থ—''A Treatise on Heat'' এবং ''A Treatise on Physics'' আজও বিজ্ঞানের পথে মানুষকে সঠিক পথ দেখায়।

নদীর দেশের মানুষ মেঘনাদ। বাড়ির সামনে বাংলা নদীর বর্ষাকালে রূপের পরিবর্তন ছেলেবেলা থেকেই দেখেছেন। আমাদের দেশে বন্যার ভয়াবহতা, ক্ষয়ক্ষতি তাঁকে বিশেষ পীড়া দিত। ১৯১৩ সালে তিনি যখন এম.এস.সি. পড়ছেন বর্ধমানে দামোদর নদের বন্যায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি যখন প্রথম ইউরোপ যাত্রা সেরে দেশে ফিরলেন, উত্তরবঙ্গে পাবনা-বগুড়া-রাজশাহী জুড়ে প্রবল বন্যার হাতছানি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে চলছে ত্রাণের কাজ। রিলিফ কমিটির প্রচার সচিব রূপে মেঘনাদ এসময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। ১৯৩২ সালে উত্তর-পূর্ববঙ্গের বন্যাতেও মূল্যবান ভূমিকা নেন তিনি। এই সময় 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় 'বাংলার বন্যা ও তাহার প্রতিকার' শীর্ষক রচনা এই বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতা প্রমাণ করে। প্রফুল্লচন্দ্রের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে যে অভিনন্দন গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল তাতে মেঘনাদ সাহা লিখিত 'Need for Hydraulic Research Laboratory in Bengal' শীর্ষক রচনাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি রূপে নিজের ভাষণে সর্বপ্রথম নদীউপত্যকা উন্নয়ন ও দেশে উদকবিদ্যা বিষয়ক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেন। ১৯৪৩ সালে বাংলা সরকার দামোদরের বন্যা সংক্রান্ত অনুসন্ধানে যে কমিশন নিয়োগ করেন, মেঘনাদ ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বিজ্ঞান পত্রিকায় দামোদরের বন্যা ও তার প্রতিবিধান বিষয়ে মেঘনাদ রচিত অসংখ্য প্রবন্ধেই লালিত হয়েছিল দামোদর নদীপরিকল্পনার বীজ। যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি অথরিটি অনুসরণে দামোদর নদীতে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা গঠনের প্রস্তাব মেঘনাদ সাহাই প্রথম করেছিলেন। ওড়িষার মহানদী পরিকল্পনাও তাঁরই পরিকল্পনাপ্রসূত।

এলাহাবাদ ছেড়ে কলকাতা পৌঁছানোর পর মেঘনাদ সাহার কর্মপরিধি ও ব্যস্ততা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখনও মহাত্মাজীর ভাবনা অনুযায়ী চরকা ও খদ্দরের হাত ধরে স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানোর স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু দূরদর্শী মেঘনাদ বুঝেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রকৃত উন্নতির জন্য কুটিরশিল্প নয় বরং মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের বিকাশ প্রয়োজন। গুরুদেব প্রফুল্লচন্দ্রের সাথে এই বিষয়ে মতান্তর ঘটলেও তিনি নিজের ধারণার প্রতি বিশ্বাসে অটল ছিলেন। ভারতের বিকাশে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সাথেও মেঘনাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মেঘনাদ তাঁর যাবতীয় পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করে জওহরলাল নেহেরুর হাতে দেন এবং নেহেরুজী তা পাঠ করে বিস্মিত হন ও মন্তব্য করেন 'ইতিহাসে পরিকল্পনার জনক রূপে আপনার নাম কীর্তিত হবে।' স্বাধীন ভারতে শিল্পের বিস্ময়কর বিকাশ তাই মেঘনাদ সাহার পরিকল্পনার সুফল বিশেষ। ১৯৫১ সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি নির্দল প্রার্থী রূপে উত্তর কলকাতা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবশিষ্ট জীবনযাপন সমগ্র দেশের পক্ষে লাভদায়ক হলেও ভারতের বিজ্ঞান জগত এতে বঞ্চিত হয়েছিল। এ সময়ে মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে 'পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি' জ্যোতির্বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে সারা ভারত জুড়ে বারোটি ভাষায় নিখুঁত সময়ের পঞ্জিকা চালু করে। ১৯৫৪ সালে জেনিভায় ইউনেস্কোর ১৮তম অধিবেশনে 'বিশ্বপঞ্জিকা সংস্কার' বিষয়ে মেঘনাদের প্রস্তাব গৃহীত হল। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে পূর্ববঙ্গ থেকে অসংখ্য উদ্বাস্তুর আগমন, তাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়েও মেঘনাদ ছিলেন খুব চিন্তিত। এই মানুষটি লোকসভার সদস্য থাকাকালীন ১৯৫৬ সালের ১৬ জানুয়ারি মাত্র ৬২ বছর বয়সে চলে গেলেন লোকান্তরে।

ঢাকার শ্যাওড়াতলী গ্রামের সেই দরিদ্র বালক গুটি গুটি পায়ে স্বীয় প্রতিভা, অদম্য জেদ ও গভীর আন্তরিকতাকে সঙ্গী করে ভাস্বর হয়ে

উঠেছিলেন ভারত তথা বিশ্ব-মানচিত্রে। ছিলেন গণিতে মেধাবী ছাত্র। কিন্তু হলেন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক। শুধুমাত্র আত্মপ্রচেষ্টায় অল্পসময়ে হয়ে উঠলেন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন। এদেশে উপযুক্ত ল্যাবরেটরির বড় অভাব। তাই তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে চালিত করলেন নিজের মেধা। সঠিক গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূর্য তথা অন্যান্য নক্ষত্রদের প্রকৃত চরিত্র বিষয়ে অভ্রান্ত ধারণা মেলে ধরলেন জগৎবাসীর সামনে। আর তাঁর আবিষ্কার যখন প্রমাণিত হল আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞান পর্যবেক্ষকদের চোখে তখন মেঘনাদকে ইউরোপের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হল একবার নিজের ধারণা স্বচক্ষে পরীক্ষা করে দেখতে। মেঘনাদ আবিষ্কৃত 'তাপীয় আয়ননতত্ত্ব' পদার্থবিদ্যা তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এগিয়ে দিল বহু পথ। এ প্রসঙ্গে সতীর্থ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন "এক হিসাবে মুক্তাগুলি আগে থেকেই ছিল কিন্তু তাদের চিনতে পারা ও একত্রে গেঁথে অনতিক্রম্য সৌন্দর্যের একটি কণ্ঠহার তৈরি করবার জন্য দরকার ছিল একজন মেঘনাদের।" ভারতবর্ষের বুকে মেঘনাদই প্রথম তুলে ধরেছিলেন নদীউপত্যকা পরিকল্পনা ও উদকবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা। দামোদর, ভাকরা-নাঙ্গাল ও মহানদী পরিকল্পনা মেঘনাদের চিন্তার ফসল। ভারতবর্ষের উন্নতি ও বিকাশে শিল্পোন্নয়ন ও যথাযথ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বাস্তব রূপ পেল মেঘনাদের হাত ধরে। জার্মানির উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন সমস্যার সাথে যেমন জড়িয়েছিলেন আইনস্টাইন, তেমনি ভারতবর্ষে এই স্থান নিয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা। জীবনযাত্রায় তিনি ছিলেন গুরু প্রফুল্লচন্দ্রের অনুসরণকারী। খাটো ধুতি, কালো জুতো, গলাবন্ধ কোট—এরূপ সাধাসিধে পোষাক এবং খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় বাক্‌ভঙ্গী তাঁর চরিত্রে যোগ করেছিল এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাই শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞানী নন। ভারতে পরিকল্পনার জনক নন, 'সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা নন বরং এমন একজন মহৎ মানুষ রূপে তিনি ভারতবর্ষের সকল সন্তান-সন্ততির মনের মণিকোঠায় রয়ে যাবেন যিনি নিজের প্রতিজ্ঞা, নিজের জীবন, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা উৎসর্গ করেছিলেন দেশের উন্নতিকল্পে ও মানুষের সার্থকতার মাঝে।

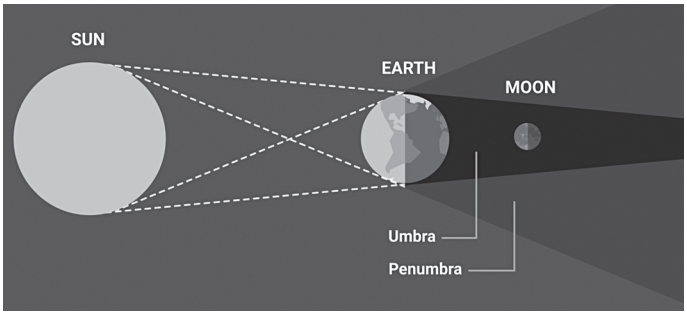
লেখক শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: rajdipb1996@gmail.com • M. 9836569850

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

অনিন্দ্য দে

আমাদের চন্দ্রালোক অভিযান



পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ আমাদের এক অতি পরিচিত ঘটনা। সূর্য আর চাঁদের মাঝখানে পৃথিবী এসে পড়লে, পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে পুরোপুরি ঢেকে দেয়। ফলত বেশ কিছুটা সময়ের জন্য আমরা চাঁদকে আর দেখতে পাই না। কিন্তু ভালো করে দেখেছ কি, পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে পুরোপুরি ঢেকে দিলেও চাঁদ একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় না। চাঁদের আকারের একটা লালচে আভা আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

আসলে পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে পুরোপুরি ঢেকে দিলেও, সূর্যের আলোর সামান্য কিছু অংশ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে চাঁদের ওপর গিয়ে পড়ে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের দ্বারা ঐ প্রতিসৃত আলোর বিক্ষেপণ বা স্ক্যাটারিং ঘটে। বায়ুমন্ডলে উপস্থিত গ্যাসের অণুগুলোর মাপ সাধারণত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হয়। তাই লালের তুলনায় নীল আলোর বিক্ষেপণ অনেক বেশি হয়। ঠিক এই কারণেই, রাস্তা আলোকিত করার কাজে নিয়ন আলোর তুলনায় সোডিয়াম বাষ্প নিঃসৃত আলো অনেক বেশি কার্যকরী হয়। নীলচে নিয়ন আলোর তুলনায় সোডিয়াম আলোয় হলদে ভাগ বেশি। তাই তার বিক্ষেপণ অনেক কম হয়, আর বায়ু ভেদ করে বহু দূর অবধি চলে যেতে পারে। আর সেই কারণেই চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ওপর যে আলো গিয়ে পড়ে তা মৃদু ও লালচে দেখায়।

চাঁদনি রাতে বিমানপথে একটা নদীর অনেক ওপর দিয়ে যেতে যেতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে এক বিস্ময়কর দৃশ্য চোখে পড়ল। দেখা গেল নদীর জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব এত বড় দেখাচ্ছে যে সেটা চওড়ার দিকে নদীর মধ্যে আর আঁটছে না। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীটাকে ক্রমশঃ সরু দেখাচ্ছিল। তাহলে চাঁদের প্রতিবিম্ব অতটা বড় হয়ে গেল কীভাবে?

চাঁদ যে আমাদের থেকে অনেকটাই দূরে আছে, সেটা নতুন করে বলার কিছু নেই। মাটি থেকে এরোপ্লেনের উচ্চতা সেই তুলনায় কিছুই নয়। আমরা জানি, সমতল আয়নায় যে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়, আয়না থেকে তার দূরত্ব আয়না থেকে বস্তুর দূরত্বের সমান হয়; আর প্রতিবিম্ব বস্তুর আকারের সমান



হয়। কাজেই নদীর জলে চাঁদের প্রতিবিম্বটাও থাকে অনেক দূরে। এই দূরত্বের তুলনায় প্লেনের উচ্চতা নগণ্য, তাই মাটি আর প্লেন এই দুই জায়গা থেকেই চাঁদের প্রতিবিম্বটা প্রায় সমান আকারের দেখায়। কিন্তু ওপরে উঠতে থাকলে নদীটা ক্রমশই সরু দেখায়। আর এমন একটা অবস্থা আসে যখন সেটাকে প্রতিফলিত চাঁদের চেয়েও সরু মনে হয়।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: anindya05@gmail.com • M. 9432220412

র ণ জি ৎ পা ল

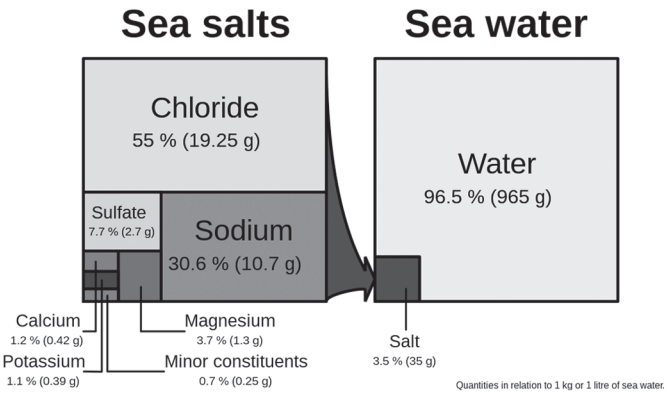
সমুদ্রের গোপন কথা



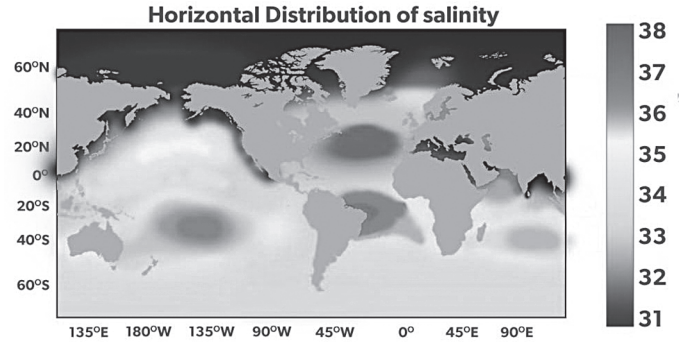
পৃথিবীর বাইরে থেকে এই গ্রহকে যে নীল নীল জল। বস্তুত জল তো আর নীল নয় আকর্ষণই বা কিসে! আকাশের নীল বরং সমুদ্র বিশ্বের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রধান অংশ শক্তিকে বায়ু ও জলের গভীরতা এনে সমুদয় অঞ্চলে বিতরণ করে দেয়। ব্যষ্টি অতিকায় চৌবাচ্চার কাজ করে যেখানে থাকে—যা থেকে আমাদের নিঃশ্বাসবায়ুর যাবতীয় সামুদ্রিক প্রাণী ও জীব তাদের যোগান পায়, রসদ পায় এবং তা পৃথিবীর খাদ্যশৃঙ্খলের অনেকটাই বা বহুলাংশেই দেখায় তা সমুদ্রের অপার নীল গভীর তবু এই মায়াটুকু না থাকলে সমুদ্রের শুষে নিয়েই সে নীল। বিজ্ঞানের চোখে এবং সে সূর্য থেকে প্রাপ্ত বিকিরণজাত দেয় এবং এই রূপান্তরিত শক্তিকে পৃথিবীর থেকে সমষ্টিতে মিলে গিয়ে সমুদ্র বিবিধ দ্রবীভূত গ্যাসসমূহ সংরক্ষিত উপাদান তৈরি তথা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং জন্ম ও বেঁচে থাকার স্থায়ী পরিবেশের সামগ্রিক প্রাণীকুলের অর্ধেক বা বেশি। আসে সমুদ্র থেকে।

পৃথিবীর জন্ম থেকে তা প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে মতান্তরে সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে—জলের সামগ্রিক পরিমাণ বাষ্প অথবা মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে বা পুনরায় হিমায়িত হয়ে অবশেষে বর্তমানের জলে এসে স্থায়ী হলেও জলের সামগ্রিক আয়তন কিন্তু ঐ একই। গড়ে বত্রিশ শত মিটার (বা দুই মাইল) এবং কোথাও কোথাও দশ হাজার মিটার (বা ছয় মাইল) গভীর; সামুদায়িক হিসাবে জলের মোট আয়তন একশো কুড়ি কোটি ঘন কিলোমিটার এবং ওজন তেরো লক্ষ কোটি টন মাত্র (বা ১.৩ মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন টন)। যদিও সমুদ্রের ওজন পরিবেশের ওজনের চেয়ে দুশো পঞ্চাশ গুণ বেশি কিন্তু তা পৃথিবীর ওজনের চার হাজার ভাগের একভাগ। বর্ধিত জনসংখ্যা ও মানবদেহের স্থূলতার বৃদ্ধির কারণে এই হিসাবে গরমিল হচ্ছে কিনা জানা নেই। এখন দুঃখের কথা, সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়টির জন্ম কমবেশি মাত্র একশো বছর আগে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জীববিদ্যা নিয়ে সমুদ্রবিদ্যা বিশাল বিশ্বরীতির অন্তর্গত হয়ে পারস্পারিক ভাবে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক ও পরিচয় পাকা করে নিয়েছে।

সমুদ্রকে জানতে গিয়ে প্রথম প্রশ্ন হতে পারে সমুদ্র কেন লবণময়। একথা সকলেই জানে খনিজ পদার্থের মধ্যে আটক থাকা লবণ নদীনালা (নদীতো প্রকৃতির নালা) দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নেমে এসে মিশে যায় সমুদ্রে। সমুদ্রপৃষ্ঠের জল বাষ্পীভূত হয়ে পরিচলন হয়ে গিয়ে (ইভ্যাপো ট্রানসপোর্টেসন পদ্ধতিতে) প্রবাহিত হয়ে গিয়ে জমিতে গিয়ে পড়ে বৃষ্টি হয়। তাহলে, লবণ উদ্বায়ী নয় বলে তা সমুদ্রেই থেকে যায় এবং ক্রমপুঞ্জিত এই থেকে যাওয়া লবণের কারণে তা সমুদ্রের জলের লবণতা বাড়তেই থাকার কথা। তা কিন্তু হয়নি।



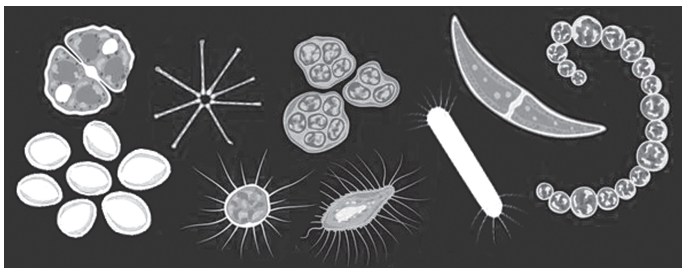
যাবতীয় প্রকারের প্রাণীকুলের শরীরের আবাসে যে তরল বহমান, তার লবণময়তা সমুদ্রের লবণতার থেকে কম। রহস্য কি! সমুদ্রের লবণতা মাপার ব্যবস্থা এরকম—একশো অংশ জলে লবণের কতগুলি অংশ আছে তার শতকরা হিসাব। সমুদ্রের জলে ৩.৪ শতাংশ লবণ, যেখানে আমাদের রক্তে আছে ০.৮ শতাংশ। এমন হিসাব বা বৈষম্য হল কী করে। সকলেই জানে জল অর্থাৎ সমুদ্র থেকে একসময় প্রাণীদের পূর্বপরিচয় এককোষি প্রাণী ডাঙ্গায় ওঠে—ঐভাবে ওঠার আগে পর্যন্ত সমুদ্রের লবণ পরিবেশ এবং সামুদ্রিক প্রাণীর শরীরে বহমান জলীয় তরল একেবারে একরকম ছিল যাকে এখন বলা যায় আইসোটোনিক। বিবর্তনের কোন একটি পদক্ষেপে জীব যখন ভূমিতে এল তখন তার জিনগত বৈশিষ্ট্য ও লবণতা স্থির হয়ে গেল; অন্যভাবে বলা যায় জীবাশ্মভূত হয়ে গেল। তথাপি সমুদ্রের জলের লবণতা বাড়তে থাকল কিন্তু বৃষ্টিধৌত খনিজ লবণের মাত্রা সমুদ্রের জলে মিশতে থাকলেও মাত্রার খুব বেশি পার্থক্য তৈরি হল না। জেমস্ লাভলক



কৃত একটি হিসাব থেকে পাওয়া যাচ্ছে—সমুদ্রের জলে লবণের উপাদান প্রতি বছর ৫৪০ মেগাটন এবং সামগ্রিক জলের আয়তন ১২০ কোটি ঘন কিলোমিটার—অংকের হিসাবে তা দাঁড়ায় ৩.৪ শতাংশ। অর্থাৎ সমুদ্রজলের লবণতার এই মাত্রায় পৌঁছতে লেগেছে আট কোটি বছর এবং ধরা যাক তা হল সমুদ্রের বয়স। অন্য এক পদ্ধতিতে সমুদ্রের বয়স স্থির হয়েছে ছয় কোটি বছর—সেটি এক পুরাতন নোর্স তত্ত্ব। ভূতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানীরা ব্যাকটিরিয়ার দেখা পেয়েছে সমুদ্রের জলে সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে। সেই ধারণা

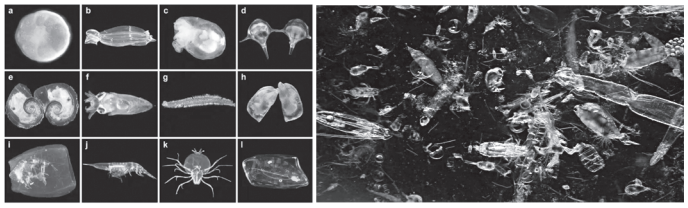
থেকে বলা যেতে পারে সমুদ্রের বয়সও ঐ সাড়ে তিনশো কোটি বছর। এই সিদ্ধান্ত রেডিওঅ্যাকটিভ পরিমাপ থেকে প্রাপ্ত হিসাবে দাঁড়ায় সাড়ে চারশো কোটি বছর। এই সামান্য ইতরবিশেষ নিয়ে অসামঞ্জস্য দূর করতে প্রামাণ্য তথ্য পেতে আরও গবেষণা সাপেক্ষ বিতর্ক তোলা যাক—বরং বিচার করা যাক সমুদ্র কেন লবণাক্ত?

বৃষ্টি ও নদী বেয়ে আসা খনিজের তত্ত্ব মেনে নিয়েও একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে, লবণ কী তাহলে কিছু পরিমাণে হলেও উধাও হয়ে যাচ্ছে সমতুল্য পরিমাণে! বা কোথাও কি কোন নিমজ্জমান ব্যবস্থা বা 'সিংক' আছে সমুদ্রতলে, যেখান দিয়ে কিছু পরিমাণ লবণ উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই জটিলতর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে সমুদ্রের অভ্যন্তরে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির অধিষ্ঠান যাচাই করে এর সত্যাসত্য খোঁজা যাক। সমুদ্রজলকে যদি একরকম ঝোল বা 'স্যুপ' মানা যায় তাহলে ঐ 'ঝোলে' আছে শৈবাল, ফাইটোপ্ল্যাংটন, জুপ্ল্যাংটন এবং দ্রবীভূত বা ভাসমান সব অজৈব পদার্থ—



কয়েকটি ফাইটোপ্লাঙ্কটন

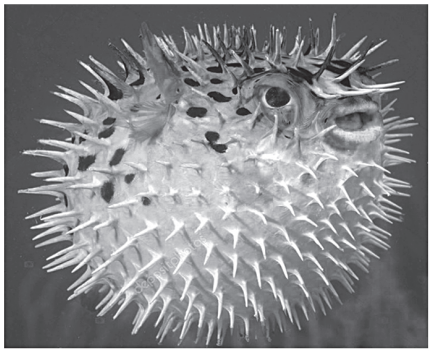
রসায়নের খাতিরে লবণ নামের আড়ালে নানা উপাদান আছে যার মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে অন্যতম উপাদান হিসাবে। সমুদ্রের জলের গড় নমুনায় প্রতি কিলোগ্রাম অজৈব লবণের ওজনে ৩.৪ শতাংশ লবণতা



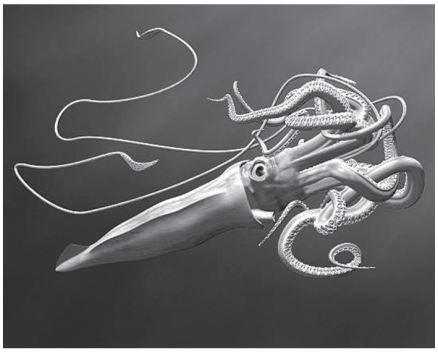
থাকে। যার মধ্যে ৭০ শতাংশই আবার সোডিয়াম ক্লোরাইড। মজার কথা সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হয় পজিটিভ সোডিয়াম ও নেগেটিভ ক্লোরাইড 'আয়ন' দিয়ে। এরা জলে সাবলীল স্বাধীনতা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় জলের পরমাণুর মধ্যে। অবাক হওয়ার কথা, বিপরীত তড়িৎ আধান (চার্জ) সর্বদাই একে অন্যকে আকর্ষণ করে এবং সাধারণত আয়ন জোড়া অবস্থায় জোড় বেঁধে থাকে। এর কারণ হতে পারে জলের তড়িৎ আধানকে কমজোরি করার কিছু ব্যবস্থা বিপরীত আধানযুক্ত আয়নকে দুর্বল করে দেয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দ্রবণকে মিশ্রিত করলে সেখানে চারটি আয়ন পাওয়া যায় : সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড ও সালফেট। কিন্তু দ্রবণটিকে যদি এমন অনুপাতে মেশানো হয় তখন তাকে সোডিয়াম সালফেট এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড উপাদান পৃথক করা যায়। কাজেই সমুদ্রজলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আয়ন আছে একথা সর্বাংশে সত্য নয়—বলা যায় এতে উপাদানগত ভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড আয়ন আছে। এতে ম্যাগনেসিয়াম ও সালফেট আয়ন একত্রে আছে এবং অল্প অল্প পরিমাণে অন্য অন্য আয়ন আছে—ক্যালসিয়াম, বাইকার্বোনেট এবং ফসফেটেরও। এ সমস্ত গুণগত উপাদানের অস্তিত্ব মিলে জীবনের নানা লক্ষণ তৈরি করে চলেছে সমুদ্রের জলে। জীবনের ধর্ম বা লক্ষণ জারি আছে কোষে লবণময়তার সুযোগে এবং কোষের অন্দরের লবণতা ও বাইরের পরিবেশের লবণাক্ততা এমন চতুরভাবে। যোগ্যতার সঙ্গে বিরাজমান যে ঐ লবণময় পরিবেশে কখনোই সমুদ্রজলের লবণ ছয় শতাংশের বেশি



বক্স জেলিফিস



পাফার মাছ



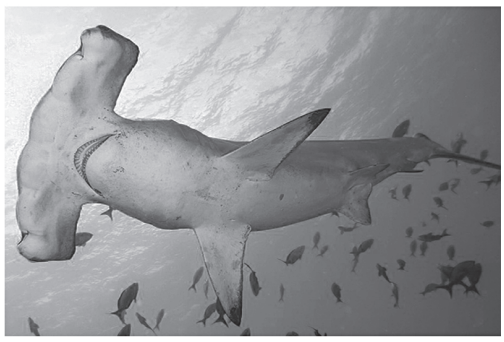
জায়েন্ট স্কুইড



হাম্পব্যাক তিমি

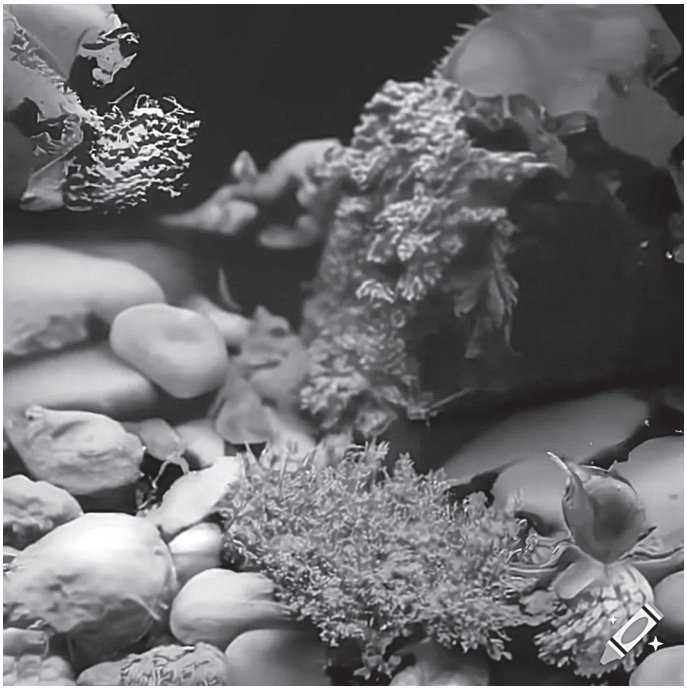


লায়ন মাছ



হাতুরি মাথা হাঙর

থাকবে না মাত্র কয়েক সেকেন্ড ব্যতীত। কী আশ্চর্য রহস্য! অবশ্য এর বাইরে এমন প্রাণী আছে যারা অতিরিক্ত লবণজলে (যথা ডেড সি) বেঁচে থাকতে পারে এবং তাদের এমন মহিমা যে তারা ফুটন্ত জলেও বেঁচে থাকতে পারে।



যে সামুদ্রিক প্রাণী, অণুজীব লবণাক্ত জলে দিব্যি বেঁচে থাকে তাদের ত্বক বা বহিরঙ্গের খোলা অত্যন্ত শক্ত থাকার জন্য ঐ লবণ তাদের শরীরে ঢুকতে বাধা হয়। একটি সূক্ষ্ম অথচ মজার বিষয় ঐ প্রাণী (যেমন চিংড়ি) তাদের শরীরের লঘু লবণ দ্রবণ শরীর থেকে নির্গত করে দিয়ে বাইরের উচ্চ হারের লবণজলকে প্রশমিত করে লঘু করে দিয়ে থাকে। জলের এই ধর্ম, যেমন লঘু দ্রবণ থেকে শক্তিশালী দ্রবণে আসা-যাওয়া করার ক্ষমতা বা পদ্ধতিকে রসায়নবিদরা বলে থাকেন অসমোসিস। এই অসমোসিস প্রক্রিয়া যে কোনো দ্রবণের লঘু-গুরু চরিত্র বিচার করে তাকে পৃথক করে রাখে একটি পাঁচিলের মাধ্যমে এবং ভিসা যেমন নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশী-স্বদেশী গতায়াত, তেমনই অসমোসিস দুটি ভিন্ন দ্রবণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে ভিসা প্রদান করে অসমোটিক প্রেসার। সুতরাং এই চাপ বা প্রেসার দ্রবণের ভিতর ও বাইরের লবণময়তার তারতম্য বিচার করে থাকে। এখন বেশিরভাগ জীবকুল এই কৌশলের সঙ্গে সুপরিচিত এবং তাকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যদি লবণাক্ততার হার ছয় শতাংশের নীচে থাকে। এটি এক শর্ত। এবং ঐ শতাংশ যদি ছয় শতাংশের বেশি হয়ে যায় তখন জীবকোষ (প্রাণী, মেরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী যাবতীয়) ভঙ্গুর হয়ে ধ্বংস হয় (এজন্য জরুরী অবস্থা ও পরিস্থিতি সামলাতে প্রথমেই 'স্যালাইন' চালিয়ে দেওয়া হয়।

জৈব রাসায়নিক এ সমস্ত ঘটনা অলক্ষে নিরন্তর ঘটে চলেছে। পজিটিভ আয়ন জড়ো হয় পরমাণুমহলের নেগেটিভ অঞ্চলে এবং নেগেটিভ আয়ন পরমাণুমহলের নেগেটিভ ক্ষেত্রে। মৌলিক উপাদান সকলের নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়—যত বেশি শক্তিশালী হয় লবণঘনত্ব, ততই আয়নদের জন্য ছাঁকনির প্রভাব বেড়ে যায় এবং যত দুর্বল হয় লবণঘনত্ব ততই আকর্ষণ বেড়ে যায়। (আকর্ষণ বিকর্ষণের এই ব্যাপারটি ঘটে থাকে যৌবনে নারীপুরুষের সমাবেশে বা মেলামেশায়)।

প্রতিটি জীবকোষের আচ্ছাদক বর্মের মধ্যে থাকে আয়ন-পাম্‌ন যা বন্দী বিনিময় চুক্তির আদলে আয়ন বিনিময় করে কোষের প্রয়োজন অনুযায়ী কাকে ভেতরে আসতে দেবে আর কাকে বের করে দেবে। আশ্চর্যের কথা সমুদ্রের জলের লবণাক্ততা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে খুবই কম পরিবর্তন হয়েছে। যদিবা যতটুকু পরিবর্তন হয়েছে ঐ ছয় শতাংশ অতিক্রম করেনি লবণমাত্রা। এখন বর্তমানের ৩.৪ শতাংশের বেশি বা এমনকি যদি তা ৪ শতাংশও ছাড়িয়ে যেত, তাহলে বিবর্তনের যাত্রাপথে অন্য ধরনের জীবকুল তৈরি হওয়া আশ্চর্য ছিল না।

সমুদ্রের জল থেকে পজিটিভ ম্যাগনেসিয়াম আয়ন এবং নেগেটিভ ক্লোরাইড ও সালফেট আয়ন সরিয়ে ফেলার কাজ পৃথকভাবে করতে হবে—কারণ পজিটিভ ও নেগেটিভ আয়ন জলীয় মাধ্যমে স্বাধীনভাবে বিরাজ করে। আর একটি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়—মহাদেশীয় ধৌতি থেকে আরো বেশি সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত হয় ক্লোরাইড ও সালফেট আয়ন যুক্ত হওয়ার চেয়ে; অগত্যা তড়িৎ আধানকে সবল বা স্থায়ী করতে নেগেটিভ তড়িৎ আধানযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকন আয়ন যুক্ত করা প্রয়োজন সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য; সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যে পজিটিভ তড়িৎ আয়ন বেশি যুক্ত করে থাকে, তাকে সমন্বয় করার জন্য।

দৃষ্টির পরিধির বাইরে থাকে বলে সমুদ্রের তলায় কত কী আছে তা নিয়ে মানুষের অপার বিস্ময়ের শেষ নেই—ধরিত্রীর অর্ধেক বা তার বেশি জীববৈচিত্র সমুদ্রের গভীরেই আছে। ডাঙাতে বিচরণ করে বলে জীবকুল এখানে বেশির ভাগই দ্বিমাত্রিক এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা ভূতলে যুক্ত। সামুদ্রিক প্রাণীর সংখ্যা-ঘনত্ব-বৈচিত্র স্থলচর প্রাণীকুলের চেয়ে বেশি না হলেও কম নয়—জলে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব না থাকায় চারণক্ষেত্র ত্রিমাত্রিক। স্থলে-ভূমিতে যেমন সূর্যের শক্তিকে ফোটোসিনথেসিসের মাধ্যমে খাদ্য ও অক্সিজেনে রূপান্তর ঘটে যায়, তেমনই সমুদ্রজলতলে ভাসমান শৈবাল (অ্যালগি) একইভাবে সমগ্র মহাসাগরীয় প্রয়োজনকে শক্তি ও খাদ্য জোগায়, ভূপৃষ্ঠে যেখানে বৃক্ষজগৎ প্রোথিত হয় জঙ্গমতা হারায় বা তৃণভোজীদের খাদ্য হয় সেখানে মাংসভোজী তিমিকুল জুপ্ল্যাংটন-চিংড়ি-ক্রিল (অণুজীব) ইত্যাদি ভোজন করে পরিবেশে সামঞ্জস্য আনে।

সমুদ্রে এককোষী ফাইটোপ্ল্যাংকটন (অণুজীব) জীবনের ভিত্তি—যারা জুপ্ল্যাংকটনের (এও অণুজীব) খাদ্যের যোগান। খাদ্যশৃঙ্খলে এই উপাদানগুলি সামুদ্রিক প্রাণীকুলের খাদ্যভান্ডার। এরা মিলিতভাবে সমুদ্রতলের একশো মিটার গভীরতার মধ্যে বিচরণ করে। এদের শরীরের গঠনে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট খোলস বা আবরণ তৈরিতে সাহায্য করে (কাঁকড়া বা চিংড়ির খোসাতে তা থাকে); আর আছে ডায়াটম নামের একপ্রকার অ্যালগি (শৈবাল) যার কাঠামোতে সিলিকা থাকে। এরা এবং অন্য নানাপ্রকার উপাদান মিলে বৈচিত্রপূর্ণ জীবভান্ডার ঐশ্বর্যময়ী রহস্য হয়ে অপার কৌতূহলের বিষয়।

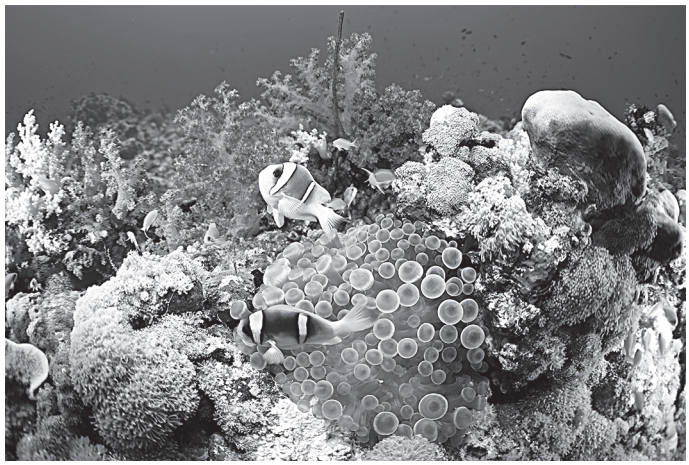
বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সিলিকা খনিজটি মাত্র এক শতাংশ বা তারও কম ধৌত হয়ে গিয়ে মেশে সমুদ্রে এবং তা সমুদ্রজলতলের উপরে ভেসে থাকে, ডায়াটমরা ঐ সিলিকা শুষে নেয় এবং ক্ষণস্থায়ী আয়ন নিয়ে ভাসমান অবস্থায় কাটিয়ে মারা যায় এবং সমুদ্রতলে গিয়ে জমতে থাকে বর্জ্য বা গাদ

বা পলি হিসাবে। ঐ সমস্ত কঙ্কাল জমে জমে প্রায় তিরিশ কোটি টন সিলিকা পাললিক শিলা হিসাবে জমতে থাকে ফি বছর। সমুদ্রজলতলে সিলিকার উপস্থিতি ডায়াটমের সঙ্গে সম্বন্ধ এমন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, যে নানা কারণে ডায়াটম গোষ্ঠী প্রবৃদ্ধি হতে পারে না। এখন ডায়াটম ও কোকোলিথদের (ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও একরকম অ্যালগি দিয়ে তৈরি) জীবনচক্র এমন যে যখন তারা মারা যায়, তাদের নরম কোমল শরীরাংশ দ্রবীভূত হয়ে গিয়ে সূক্ষ্ম পাতলা খোসা বা খোলা নিমজ্জিত হয়ে সমুদ্রের ভূমিপৃষ্ঠে গিয়ে জমে। স্তরে স্তরে স্তরীভূত হতে থাকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। ঐ স্তরগুলি তৈরি করে চক এবং চুণাপাথর (কোকোলিথরা যুক্ত) এবং সিলিকেট (ডায়াটম যুক্ত খনিজ যৌগ, যা বালুকণার মত)। সমুদ্রে এমন জৈব রাসায়নিক বাতাবরণ থেকে কত শত ক্রিয়া বিক্রিয়া চলছে তার অজানা রহস্য এখনো অধরা ও অপার। এর মধ্যে নরম পদার্থসমূহ অজৈব কঙ্কালের সাথে মিলে জলের নীচে থিতিয়ে যেতেই থাকে নিরন্তরকাল ব্যাপী এবং পরিণতিতে তা সমাধিস্থ হয় জীবাশ্মইন্ধন (বা জীবাশ্মতেল বা পেট্রোলাদি তৈল), সালফাইড আকর এবং এমনকি মুক্ত অবস্থার সালফার হিসাবে জমা হয়।

কনভেয়ার বেল্ট যখন চলতে শুরু করে তখন নির্দিষ্ট বস্তু সে বহন করে নিয়ে চলে দূরান্তরে; এখন চলমানতা জারি থাকার সময় অন্য যেকোন বস্তু পতিত হলে তাও বাহিত হয়ে চলবে। সমুদ্রেও এমন একটি ঘটনা পরম্পরার কনভেয়ার বেল্টের সমতুল্য প্রক্রিয়া নজরে পড়ে। এই সূত্র মেনে নিয়ে বলা যায়, সমুদ্রে জমা হওয়া লবণ, বৃক্ষ তথা প্রাণীকুলের মৃত অবশিষ্ট বৃষ্টিধারায় পতনের মত সমুদ্রের নীচে তলানি হিসাবে জমা হয়। ধারা-পাত যেমন পরিবেশের নানা এলোমেলো ছড়িয়ে থাকা রাসায়নিক ধূলিকণা সমূহকে নিয়ে নেমে আসে, সমুদ্রের নীচেও তেমনিভাবে যা ঘটে থাকে—অবিকল একরকম। সমুদ্রের জলের লবণাক্ততার ঈষৎ তারতম্যের কারণে হতে পারে—শক্তখোলা আবরণে প্রাণী বা অন্য জীব লবণের প্রতি অনুভূতিশীল হওয়ার জন্য মৃতপ্রায় হয়, বা মারা যায়। তাদের আবরণের খোলাতে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া লবণও সমুদ্রের তলদেশে অবতরণ করে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের জলে লবণের—প্রতিনিধিত্ব কমে যায় অর্থাৎ লবণময়তা হ্রাস পায়। সমুদ্রতলদেশ থেকে ঐ লবণকে চিহ্নিত করে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াটি এতখানি অনিশ্চিত বা শ্রম-অসাধ্যজাত যে লবণ হরণের দায়ভাগ সমুদ্রের সমাধি অঞ্চলকে চাপিয়ে দেওয়া বস্তুত বৈজ্ঞানিক ধারণার পরিপন্থী। তথাপি আবহমান কাল ধরে সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ যে ৩.৪ শতাংশে ভিত্তি হয়ে রয়েছে—তার একটি আপাত গ্রহণযোগ্য হাইপোথেটিক্যাল ব্যাখ্যা হিসাবে একে মান্যতা দিয়ে উপস্থাপিত করা যায়। এভাবেই সমুদ্রের জলের লবণাক্ততা এক স্থিতিশীল পরিমাণের মধ্যে দেখা যায়। এভাবেই জীব সৃষ্টি ও তাদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখা সহজ হয়েছে।

বিজ্ঞানী ব্রোকার এ বিষয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণারত, তিনি ক্লোরাইড ও সালফেট পৃথক করে চিহ্নিত করেছেন। আগে এর উল্লেখ আছে। অন্য একটি সম্ভাবনা তাঁর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে—গভীর সমুদ্র বা মহাসমুদ্র অঞ্চল ছাড়া, অন্য যে সব উপসাগর এর মধ্যে তিনদিক মুক্ত বা স্থলবেষ্টিত দুই প্রকার সাগরের কথাই আছে এবং অগভীর জলবিন্যাস বা স্থলভূমি দ্বারা আবদ্ধ লেগুন ইত্যাদি সমুদ্র সম্পর্কিত জলাশয় আছে, সেখানে সঙ্গত কারণেই বাষ্পীভবন বেশি ও দ্রুত হয়ে থাকে; অগত্যা সেসব সমুদ্র অঞ্চলের জলে লবণের ভাগ বেশি। একটি মত বলছে সমুদ্রে প্রাণের সৃষ্টির প্রভাব থেকেই ভিন্নতর কারণে লেগুন তৈরি হয় এবং হোমিওস্ট্যাসিস অর্থাৎ বহিরঙ্গের তাপমাত্রা যাইহোক না কেন দেহের অভ্যন্তরের তাপ স্থিতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে। তখন অন্য একটি কার্যকারণ ধরা পড়ছে—তা হল, সমুদ্রজলের লবণ দূর করার জন্য অজৈব রাসায়নিক শক্তিগুলির প্রতিবর্তী সক্রিয়তাই সম্ভাব্য কারণ।

প্রসঙ্গত জানাই, প্রবালকীট পরিবার সমুদ্রের বিশেষ ক্রান্তীয় কিছু



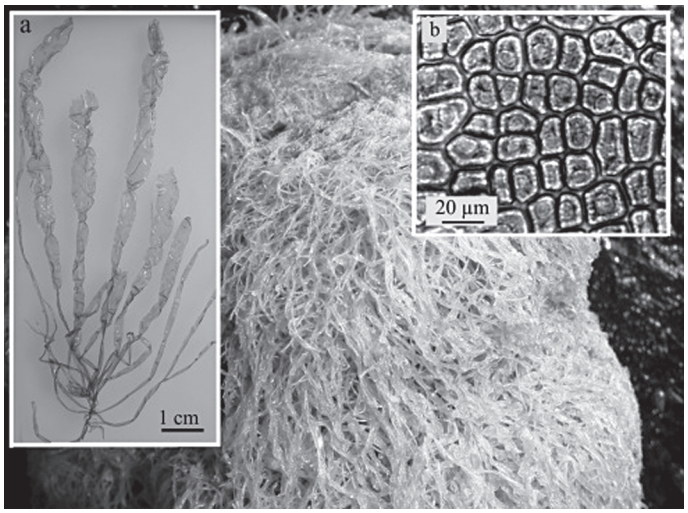
অঞ্চলে মাইলের পর মাইল যে প্রাচীর নির্মাণ করেছে—বিভিন্ন জীবকুল মিলে তা এক আশ্চর্য নির্মাণ বা স্থাপত্যও বটে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বের যে গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ তা সম্ভব হয়েছে অর্ধসমাপ্ত লেগুন থেকে বাষ্পীভবনের জন্য। দুঃখের ব্যাপার ঐ 'রীফ' দূষণের জন্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমুদ্রের নীচে যে অগ্ন্যুৎপাত হয় বা হয়ে চলেছে এবং ফলে যে উষ্ণতার তারতম্য তার সঙ্গে প্রাণ সৃষ্টি অথবা 'লিভিং আর্থ সিসটেম' যুক্ত আছে এমন ধারণা বিজ্ঞানীদের কাছে সমুদ্র বিজ্ঞানের চর্চাকে আদরণীয় করেছে। [মানবদেহেও এই তাপের প্রশ্নটি গর্ভাশয়ে ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর মিলনের ফলে ভ্রূণ নিষিক্ত হওয়ার সময় জরুরী—৭৭° থেকে ১০০° ফারেনহাইট তাপমাত্রা অবিকল্প শর্ত। কাজেই উষ্ণতা অর্থাৎ তাপ প্রয়োজন ও জরুরী।] অগ্ন্যুৎপাতের কারণে অতি ক্ষুদ্র বালুকণা যা সমুদ্রতলে পতিত হয় তা সবই সিলিকা তলানি বা পলি হয়ে সমুদ্রতলের পাতলা প্লাস্টিক শিলার (জেমস লাভলক শব্দটি ব্যবহার করেছেন) উপরে ধীরে ধীরে জমে জমে কখনো কোথায়ও আবের মত গর্ত হয়েছে তলানি-পলির ওজনের ভারে। পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে যে তাপ বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে তা ঐ মোটা পুরু হয়ে যাওয়া কম্বলের মত চাদর থেকে বাধা পায়; যদিও ঐ 'কম্বল' আংশিক তাপ নিরোধকের বা অন্তরকের কাজ করে থাকে, তবু তাপ তো বাড়তেই থাকে ঐটুকু অঞ্চলের গন্ডীর ভিতরে সন্নিহিত শিলার নীচের স্তরে চাপে শিলার কাঠিন্য কমতে থাকে কিন্তু তলানির পলিও জমতেই থাকে অসমান ভাবে এবং তাপও বেড়েই চলে—এসবই দৃঢ়ভাবে জোরালো ভাবে ঘটনাকে পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে যায় এবং অবশেষে অভ্যন্তরের চাপ এত বেশি হয়ে যায় তখন সমুদ্রতলের শিলাস্তর আর তা সহ্য করতে পারে না এবং অগত্যা তখন অগ্ন্যুৎপাতের লাভা হুড়মুড় করে বিস্ফোরণ হয়ে বেরিয়ে আসে। আগ্নেয়গিরিজাত দ্বীপ এমন অনেক এভাবে তৈরি হয় এবং কদাচিৎ লেগুনও। ঐ সমস্ত লাভা সমুদ্রের অগভীরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হয়ে তা জমে—কখনো বা চক বা চুণাপাথর হয়ে আবির্ভূত হয় (ইংল্যান্ডের সেভেন সিস্টারস্ হিল এমনই একটি ভ্রমণার্থীর ভ্রমণ তালিকায় রাখা থাকে)। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের অন্য কারণও

যদিও অনুপস্থিত নয়, তবু এটা অতিরঞ্জিত হবে না যদি বলা হয় মনুষ্যসৃষ্টি ড্যাম বা বাঁধ তাদের ওজনের চাপের তারতম্যের কারণেও ভূমিকম্প ঘটিয়ে থাকে। ঐ একইভাবে প্রবাল কীটজাত স্তরীভূত তলানির চাপের প্রভাব এই প্রকারের বিপর্যয় ঘটানোর পক্ষে সম্ভাবনা অসীম।

বিজ্ঞানীদের সংশয় তবু থেকেই যায়। সমুদ্রের লবণাক্ততার নিয়ামক শক্তির চরিত্র বা উৎস কী! ফসফেট, নাইট্রেট বা সমুদ্রতলের বিস্তীর্ণ এলাকায় সঞ্চিত ম্যাঙ্গানীজ? ১৯৭১ থেকেই পৃথিবীর সালফার বরাদ্দ নিয়ে কৌতূহল বাড়তে থাকে; 'শ্যাকলটন ভয়েজ' নামের এক গবেষক জাহাজের অনুসন্ধান প্রচেষ্টা থেকে। নজরে এল জমি ও মৃত্তিকা থেকে নদীনালা খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাবতীয় ধৌতির সালফার সমুদ্রে পতিত হয়ে জমছে, ভান্ডার বাড়ছে। সালফার-ঋদ্ধ স্তর থেকে যেমন, উদ্ভিজ্জের মাটি থেকে সালফার নিয়ে আকাশে ওঠার ঘটনা বা জীবাশ্ম-জ্বালানী (কয়লাও এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) দহন ইত্যাদি সব মিলিয়েও সালফার অডিটে এক গরমিল বা অমিল বিজ্ঞনীদের কাছে ধরা পড়ছে। তাহলে কি সমুদ্রের থেকে কোনভাবে সালফার স্থলে চলে আসছে, জড় হচ্ছে? নিরন্তর গবেষণা থেকে পাওয়া গেল ডাইমিথাইল সালফাইড নামের এক যৌগের অস্তিত্ব, হাইড্রোজেন সালফাইডের আত্মীয় বটে এবং অক্সিজেন একে বিজারিত করলেও তার গতি অত্যন্ত ধীর। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন জীবাণু-কীটাণুরা মিথাইলেসন পদ্ধতির মাধ্যমে 'ডাইমিথাইল সালফাইড' যৌগ তৈরি করে নিজেদের শরীর থেকে নিকাশ করে দিতে পারে বা দেয়; কারণ 'ডাইমিথাইল সালফাইড' উদ্বায়ী হাইড্রোজেন সালফাইডের চেয়ে। সমুদ্রের ভিতরে থেকে এ কাজটি তারা অবলীলায় সমাধা করতে পারে, করে থাকে। উপাদানটি গভীর সমুদ্রে যথাসামান্য যদি থাকে, ততবেশি থাকে উত্তর ও দক্ষিণের সমুদ্রে এবং যেখানে শৈবাল (এর মধ্যে এক প্রজাতি 'পলিসিফোনিয়া ফাস্টিগিয়াটা') সেখানেই এদের উপস্থিতির আধিক্য। জাপানি বিজ্ঞানী ঈশিদা দেখিয়েছেন 'পলিসিফোনিয়া ফ্যাস্টিগিয়াটা'র দুটি উপজাতি 'ডাইমিথাইল সালফাইড' তৈরি করতে পারে। কিন্তু কার্যকরী উৎসেচক ব্যবস্থা 'স্যুইচ অন' হয়ে থাকে সমুদ্রজলে; যেমন, অঙ্কুরোদ্গম হলে কোন বীজের বিশেষ মাহাত্ম্য বা গুণাবলীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ 'ডাইমিথাইল সালফাইড' উৎপাদনে এক জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিয়তি বা প্রকৃতির নির্দেশ।

অণুজীব (ব্যাকটিরিয়ার, জুপ্ল্যাংটন ইত্যাদি) সমুদ্রতলের কাদাতে বাস করতে গিয়ে এক অদ্ভুত কৌশল তৈরি করেছে সর্বত্র; পারদ, সীসা এবং আর্সেনিকের মত বিষ বা বিষণদায়ক উপাদান এখানে রূপান্তরিত হয়ে যায় উদ্বায়ী-মিথাইল যৌগে। এই গ্যাস সমুদ্রজলের সর্বত্র বিচরণ করে এবং ঢুকে পড়ে সমস্ত অজৈব-জৈব পদার্থের মধ্যে, অতএব মাছের মধ্যেও। বিষ বা বিষণের পরিমাণ নিতান্তই কম হলে জীবকুল ক্ষতির আশঙ্কা এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু বছর আগে জাপানি শিল্পমহল, সমুদ্রে পারদ নিকাশ করেছিল এমন পরিমাণে যে তার শক্তি বিপদজনক সীমা পার হয়ে সমুদ্রপ্রাণীর মধ্যে ঢুকে পড়ে; এর ফলে যে বিষ বা বিষণ সমস্ত মাছের মধ্যেও ঢুকে পড়ে এবং সেসব মাছ খেয়ে মানুষের বিষজর্জরিত হতে হয়; বাজারে সি-ফিশের মাধ্যমে কলকাতার মানুষও খাচ্ছে; একদল গবেষক কাৎলা, ভেটকি, বোয়াল মাছের মধ্যে পারদ বিষণের খোঁজ পেয়েছেন। 'মারকারি' মিথাইলেসনের মাধ্যমে ঐ পারদ বিষণ ঘটে চলেছে। এসব তথ্য মানুষের নজরেও আনা হয়েছে। ড: দীপাঞ্জন মজুমদার থিসিস গাইড হিসাবে এ তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন। প্রসঙ্গান্তর দোষে দুষ্ট হল কিনা পাঠক বিচার করবেন, মাছের বিষণ নিয়ে আলোচনা আনার জন্য। কারণ, পারদ বিষণ থেকে কিডনী ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রথমেই; পরবর্তী ধাপে হৃদযন্ত্রকেও দুষ্ট করে। এই পারদ বিষণ থেকে জাপানি উপভোক্তাগণ অনেকে বিকলাঙ্গ হয়েছে। আবর অনেকে 'মিনামাতা' রোগে মারাও গেছে। এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া জরুরী হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে নিবেদন, মিষ্টি দোকানের রঙিন মিষ্টি নিরাপদ নয় জেনেও গ্রাহক-ক্রেতারা কেন খাওয়া বন্ধ করছেন না—এজন্য জনমত তৈরি হওয়া দরকার।



পলিসিফোনিয়া ফ্যাস্টিগিয়াটা

গাইয়া থিয়োরি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণার হাত ধরে বিজ্ঞানের সত্য হিসাবে তার মর্যাদার স্বীকৃতি এক অনন্য প্রাপ্তি; জৈব বিপাকীয় ব্যবস্থায় সালফার মিথাইলকরণ তত্ত্ব, গাইয়া নিয়ে আবিষ্কার করে জানা যায়—সমুদ্রের এবং স্থলের সালফার পরিমাণের আপাত গরমিল তাকে সুষম সামঞ্জস্য বিধান করেছে। লোকচক্ষুর আড়ালে এই ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে স্থলভূমির সমস্ত ঘাটতি পূরণের জন্য ফিরে আসতে পারত না এবং বস্তুত পরিবেশের উপাদানের ঘাটতির কারণে জৈব প্রাণীসম্পদের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা সম্ভব হত না।

শ্যাকলটন সমুদ্রযাত্রা থেকে মিথাইল যৌগের আরও এক উপাদানের অস্তিত্ব নজরে আসে—তা হল হ্যালোকারবনস্। একে পাওয়া যায় মিথেন গ্যাস সংশ্লেষ করে। এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণুকে সরিয়ে হ্যালোজেন শ্রেণির ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন বা আয়োডিনের পরমাণু থেকে কোন একটিকে যুক্ত করে এই হ্যালোকার্বন পাওয়া গেল। ঐ সমুদ্রযাত্রায় হ্যালোকার্বন খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এবং শুধু তাই নয়, 'কার্বন টেট্রাক্লোরাইড' ও 'মিথাইল ক্লোরাইড' নামের আরও দুটি হ্যালোকার্বনের খোঁজ পাওয়া যায়। সমুদ্র শৈবালে 'মিথাইল আয়োডাইড' একটি যৌগ। এই মিথাইল আয়োডাইডও বায়ুতাড়িত হয়ে স্থলভূমিতে এসে পৌঁছয় এবং আয়োডিন হিসাবে থাইরয়েড গ্রন্থির পুষ্টিতে তা যোগান দিয়ে সাহায্য করে। অন্যদিকে এই মিথাইল আয়োডাইড সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুতে উপস্থিত থেকে সমুদ্রের জলের ক্লোরাইড আয়নের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে মিথাইল ক্লোরাইড—পরিবেশের বায়ুতে এর উপস্থিতি কাজ করে এবং এরোসোল উদগীরণকারী গ্যাস হিসাবে ওজোন স্তরকে ভেঙে দেয়। ওজোনমাত্রা বেশি হলে বিপদ, কমে গেলেও বিপদ—তাই মিথাইল ক্লোরাইড বস্তুত ওজোন স্তরকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, সুস্থির করে। এইভাবে গাইয়া তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে ডাইমিথাইল সালফাইডের মত মিথাইল ক্লোরাইডের সহায়ক ভূমিকা আছে। সমুদ্রের কথা শেষ হয়েও শেষ হয় না।

লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

M. 9831206546

শা মী ম হ ক ম ণ্ড ল

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আমরা

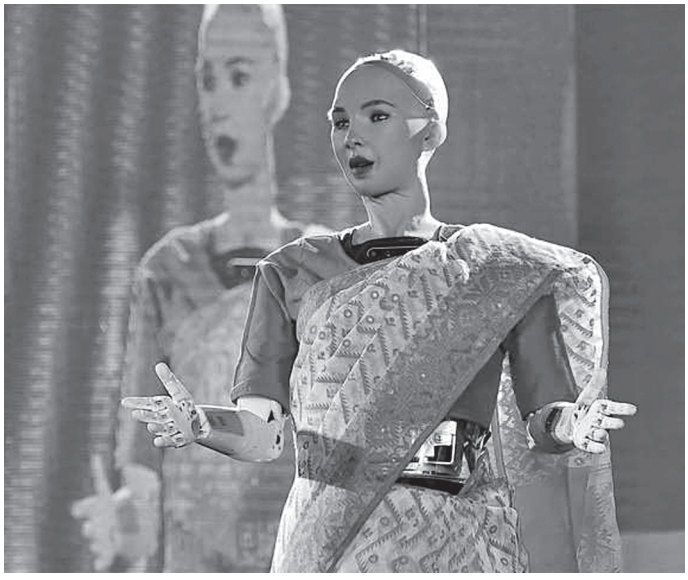


সকালে অফিস টাইমে এক্সাইডের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মোবাইল খুলে সব লিখতে গেছেন "ই", ওমনি চলে এলো, এক্সাইড টু নিউ টাউন বাস। কি এক্সাইটিং না! কষ্ট করে পুরোটা টাইপ করতে হলো না। অফিসে লাঞ্চে মন আনচান করে উঠল—কি খাওয়া যায়? খাবার ডেলিভারি অ্যাপ সবে খুলে লিখছেন বি. ওমনি গুচ্ছের নামী দামী রেস্তোরাঁর বিরিয়ানির হাতছানি। এ সবই আজ সহজ হয়েছে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার সৌজন্যে। এই সব দেখে মনে হয় না— 'এমনি করে দিন যদি যায় যাকনা'? না প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হলে শুধু হবে, এর নীচের আঁধারটাও ভাবতে হবে বৈকি।

সম্প্রতি পাশ্চাত্যের এক শহরে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা রীতিমত শেরগোল ফেলে দিয়েছিল। এক ভদ্র মহিলার কাছে একটি ফোন এসছিল অচেনা নাম্বার থেকে। ধরতেই ওপাশ থেকে তাঁর কিশোরী মেয়ের কান্না বিজড়িত কণ্ঠ ভেসে এলো, প্রথমে হতচকিয়ে গেলেও পরে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে দেখলেন, এতো তাঁর মেয়েরই গলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার অন্য একটি ফোন-মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ চেয়ে। ভদ্র মহিলা ভাবছেন, তাঁর মেয়েকে দুষ্কৃতীরা কোথায় আটকে রেখেছে? তড়িঘড়ি মেয়েকে আলাদা করে ফোনে খবর নিলেন তিনি। সে বেচারি দিব্যি আছে- কেউ তাকে পণবন্দি করেনি। তাহলে ফোনের ওপাশ থেকে কার কণ্ঠ শুনলেন তিনি? পরে জানতে পারেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে তাঁর মেয়ের স্বর নকল করে তাঁকে শোনানো হয়েছে। সাইবার অপরাধের দুনিয়ায় যার পোশাকি নাম "ভয়েস ক্লোনিং"। কি সাংঘাতিক!

ভালো-মন্দ জানতে গেলে আগে আমাদের জানতে হবে—কি এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা? সোজা কথায় বললে—যন্ত্রের মধ্যে বিবেচনা বোধ গড়ে তোলা। আমরা মানুষ, সৃষ্টির সবথেকে বুদ্ধিমান প্রাণী। কিন্তু কেন? হিসাব করতে পারি বলে? নাকি তথ্য মনে রাখতে পারি বলে? না এর বাইরেও আমাদের একটা গুণ আছে, আমাদের বিচারবোধ আছে। আমরা ভালো মন্দের পার্থক্য করতে পারি সত্য মিথ্যার সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারি, কবিতা গান প্রভৃতির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি—তাই আমরা বুদ্ধিমান। আমরা যেগুলো পারি, তার অনেকগুলোই কম্পিউটার বা গণক যন্ত্র পারে, কয়েক দশক আগে থেকে মানুষ সে সুবিধা ভোগ করে আসছে। কিন্তু যন্ত্রগণকের সেই বিচারবোধ বুদ্ধির ক্ষমতা ছিল না। মানুষের মনে কৌতূহলের উদ্রেক হল, সামনে থাকা বোকা বাক্সটি যদি মনের ভাব বুঝতে পারতো—বাড়িতে থাকা ডিজিটাল ফ্রিজটি যদি স্মার্ট ফোনে সিগন্যাল দিত ফ্রিজে ডিম শেষ হয়ে গেছে তাহলে মন্দ হয় না। ওমনি কম্পিউটারকে শেখানোর পালা কি করে বিচার করতে হবে—আরো একটু স্থূল ভাষায় বললে বলা যায়, চারপাশটা দেখে নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত কি করে নেবে— যার নাম "মেশিন লার্নিং", অনেক কম্পিউটার প্রকৌশলীর কাছে যা একটা স্বপ্নের বিষয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিহাস অনেকখানি পুরানো। আজ থেকে এক শতাব্দীর ও বেশী আগে, ১৯২০ সালে "রুশম'স ইউনিভার্সেল রোবটস" নামক এক কল্পবিজ্ঞানধর্মী নাটকে সর্বপ্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, এই বিষয় নিয়ে আরো অনেক বিজ্ঞানীরা কাজ করতে শুরু করেন, গত ছয় দশক ধরে যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে অপরিসীম উন্নতি ঘটেছে যন্ত্রমানব নির্মাণ বিদ্যায়, যার পোশাকি নাম "রোবোটিক্স"। বছর কয়েক আগেই সোফিয়া নামক এক যন্ত্রমানবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিল শহরবাসী, কি পারত না সে?



মানুষের দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করা থেকে শুরু করে, যে কোনো সমস্যায় পরামর্শ দেওয়া, জটিল অঙ্ক করা, এমনকি চিত্ত বিনোদনে তার জুড়মেলা ভার। মিশরীয় রানী, সুন্দরী নেফারতিতির আদলে নির্মিত এই যন্ত্রমানবীর মুখবায়ব তৈরী হয়েছিল ফ্রাবার নামক এক উন্নত রাবার দিয়ে। ফলত হরেক রকমের আবেগের প্রতিফলন ঘটাতে পারত তার চিবুকে। কেবল হাসি, কান্না, রাগ দুঃখই নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ডানায় ভর করে এই যন্ত্রমানবী নাকি ষাট রকম আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম, কিন্তু আবেগের বশে আমদের মত কোন ভুল সে করে না। কি অদ্ভুত এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা!

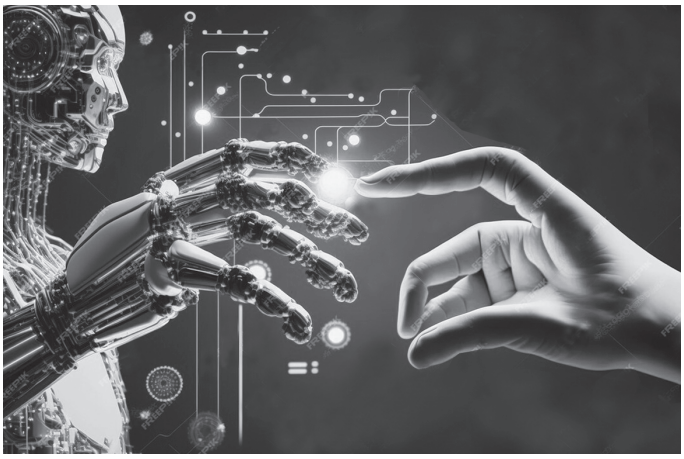
আসলে বুদ্ধিমান যন্ত্রদের মগজে ভরে দেওয়া আছে অসংখ্য তথ্য, যাদের বিশ্লেষণের ফলে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির। সেজন্যে দাবার মত বুদ্ধির খেলায়, যেখানে আপনাকে শুধুই

দূরদর্শীই হতে হবে, সেক্ষেত্রেও বিশ্বজয়ীদের বলে বলে গোল দেবে এখন কার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী রোবট গুলি। আসলে দাবা খেলায় কে জিতবে সেটা নির্ভর করে, প্রথম চালটা কে সঠিক দেবে—রোবট নাকি বিশ্বজয়ী চ্যাম্পিয়নরা, তার ওপরে। প্রথম প্রথম এই খেলায় কম্পিউটারকে বলে বলে গোল দিয়েছিলেন গ্র্যান্ড মাস্টাররা। বিশ্বজয়ী কাসপারভ একবার তো সাংবাদিক সম্মেলনে বলেই বসলেন 'কম্পিউটার কখনোই একজন ভালোমানের দাবাড়ুকে হারাতে পারবে না'। সে তখন ১৯৮৮ সাল। সদ্য কয়েক বছর আগেই তিনি ৩২টা গণকযন্ত্রকে হারিয়ে দিয়েছিলেন এই খেলায়। তার মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই কম্পিউটার বিজ্ঞানের, বিশেষত এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এত উন্নতি সাধিত হল যে, মানুষ বনাম যন্ত্রের এই খেলায়, যন্ত্রই শেষ হাসি হাসল। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান, কম্পিউটার কাজে লাগাতে লাগলো, ভবিষ্যতের কোন সমস্যার সমাধানে। যন্ত্রের জ্ঞান হলো আরো তীক্ষ্ণ। এটাই তো চাইছিলেন মেশিন লার্নিং এর উদ্যোক্তারা। এখানেই অন্ত নেই। বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা চেষ্টা করছিলেন যন্ত্রের মধ্যে চেতনা বা বিবেচনার বীজ বপন করতে। যন্ত্র যেন তাদের অর্জিত জ্ঞান যেকোন মননশীল সৃষ্টি সাধন করতে কাজে লাগাতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানে যেটি ডিপ লার্নিং নামে পরিচিত। এই ডিপ লার্নিং এর সাহায্যেই মানুষ অজস্র লোকদের মধ্যে চেনা লোককে চিহ্নিত করতে পারে। আজকাল স্মার্টফোনের দুনিয়ায় ফেস রিকগনিশন নামে আমরা অনেকেই পরিচিত।

এই ডিপ লার্নিং এর যন্ত্রণাও ভোগ করতে হচ্ছে আধুনিক প্রজন্ম কে। কৃত্রিম বুদ্ধির সাহায্যে ফেক ছবি ভিডিও ছেয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনকি অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের ফেক ছবি, আরো পরিমার্জিত করে বললে বলা যায় ডিপ ফেক ছবি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাজার সুফল ভোগ করলেও বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী দের কাছে ডিপ ফেকের হাত থেকে বাঁচা এক মারাত্মক চ্যালেঞ্জ।

এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আরেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার চ্যাট বট। যার সঙ্গে আপনি আলাপ করতে পারেন, বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারেন, যে আপনাকে কবিতা লিখে শোনাতে পারে, ছবি আঁকতে পারে। কি সেটি? আর কিভাবে কাজ করে তারা? আসলে চ্যাট বট একটি স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার প্রোগ্রাম মাত্র, যেটি দাঁড়িয়ে আছে কৃত্রিম মেধাকে সম্বল করে। এতে থাকে একটি ভাষা পরিবর্তন করার মডেল, সোজা কথায় বললে একটি গাণিতিক নকশা বা অ্যালগরিদম, যা আন্তর্জাল ঘেটে বিপুল তথ্য ভান্ডার থেকে আপনার চাহিদার মত উত্তর দিতে পারে।

বর্তমান সময়ে, সারাদিন আমরা কোন না কোন ভাবে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছি। সব খানে এ আই। মানুষ চিন্তিত ভবিষ্যতে কাজ থাকবে তো? যখন শিল্প বিপ্লব হল, তখনও এই ভয়ে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তারপরে বিজ্ঞানে বারবার যখন উন্নতি সাধন



হয়েছে, এমন উন্নতি, যা দৈনন্দিন জীবনকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তখনই আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি। এখন আমরা ভাবতে বসেছি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি এতই অপরিহার্য হয়ে ওঠে, সে কি বুঝবে কোন কবিতা পড়লে আমি মনে জোর পাব? দুঃখের গান শুনতে শুনতে আমাদের চোখগুলো যদি অশ্রু সজল হয়ে ওঠে, তখন কি ভাবে আমাদেরকে সান্ত্বনা দেবে? মন বোঝার কথা বাদই দিলাম, যন্ত্রের ভুলে বা কোন দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়ে, যদি কারো ডিপ ফেক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়, যদি কারোর ব্যাংক একাউন্টের গচ্ছিত টাকা নিমেষে গায়েব হয়ে যায়, যদি কারোর ব্যক্তিগত তথ্যাদি অন্যেরা হাতিয়ে নেয়, মেশিন কি পারবে নিজে থেকেই তার একটা সমাধান খুঁজে বার করতে? নাকি আরও বিড়ম্বনা বাড়াবে? এত সমস্যা, এত ভুল বোঝাবুঝির ভিতরে প্রশ্ন উঠতেই পারে, যন্ত্র কি তবে মানুষের পরিপূরক হয়ে উঠল? এর উত্তর লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা যন্ত্রকে কতটা সংবেদনশীল করে তুলবেন অদূর ভবিষ্যতে, তার ওপরে।

লেখক বিজ্ঞান গবেষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: shamimmondal709@gmail.com • M. 9614519387

সংবাদ : ব্লিচিং ছড়িয়ে মশা নিধন নয়

ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ার মশা নিধনে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করি। কিন্তু এতে কাজের কাজ তো হয় না, পরন্তু পরিবেশে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়। ব্লিচিং-এর জলীয় দ্রবণ ব্যাকটেরিয়া, রিকেটসিয়ার মতন জীবাণু নিধন করলেও মশা মারতে পারে না। ২৭ মার্চ এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাসাগর হলে বাহকবাহিত রোগের উপর জাতীয় সেমিনারে পতঙ্গবাহিত ভাইরাস ঘটিত রোগ ব্লু-টাংকে টিকা ও রোগ নির্ধারক কীট তৈরি করে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে তা তুলে ধরেন ভাইরাস বিশেষজ্ঞ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশক ড. ধৃতি ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. অশোককান্তি সান্যাল, ডা. ডি কে ত্যাগী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গৌতম ভদ্র, অধ্যাপক সজল ভট্টাচার্য, ডা. শঙ্কর নাথ প্রমুখ।



সাপ—শত্রু নয়, বন্ধু!

মাত্র দু-অক্ষর দিয়ে তৈরি 'সাপ' কথাটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত আমাদের সারা দেহ শিউরে ওঠে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী এই প্রাণীটি আতঙ্ক সৃষ্টিকারী হিসেবে পরিচিত। যদিও সাপ প্রাণীটি অত্যন্ত নিরীহ এবং শীতল রক্তযুক্ত। এরা অল্পতেই পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আমাদের দেশেই মারা যান সর্পাঘাত জনিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণে। অথচ পৃথিবীতে নির্বিষ সাপের সংখ্যাই অনেক বেশি (শতকরা ৮৫ ভাগ), বিষযুক্ত সাপের তুলনায়। আবার সাপ কামড়ানোর ঘটনার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেই ঘটে নির্বিষ সাপ থেকে। একটি সমীক্ষা বলছে, বিষাক্ত সাপ কামড়ালেও প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে সেরকম কোনও বিষক্রিয়া হয় না। একট পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে প্রতি ১০টি গোখরো, কেউটে, কামড়ানো রোগীর মধ্যে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা মাত্র একজনের।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, ভারতে গড়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সাপজনিত কারণে প্রতি বছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ মারা যান। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ মৃত্যুই হয় ভুল চিকিৎসা, কুসংস্কার ও সাধারণ মানুষের সাপ সম্পর্কে সম্যক ধ্যান-ধারণা না থাকায়—অথচ পৃথিবীর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিষাক্ত সাপের বাস।

সাপের সাধারণ শ্রেণী বিভাগ

সাপকে সাধারণভাবে দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা বিষধর ও নির্বিষ সাপ। বিষধর সাপ আবার দুরকম— ক্ষীণ বিষযুক্ত (যেমন— লাউডগা, কালনাগিনী, মেটেলি সাপ প্রভৃতি) ও উগ্র বিষযুক্ত।

উগ্র বিষযুক্ত সাপ আবার দুভাগে বিভক্ত যথা— ফণাধর (কেউটে, গোখরো/গোমা, শঙ্খচূড়) ও ফণাবিহীন (কালাচ, শাঁখামুটি, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি)।

সাপের খাবার

এরা সাধারণত অতি ক্ষুদ্র পিঁপড়ের ডিম থেকে শুরু করে গরু-মোষের বাচ্চা, হরিণ এমনকি চিতা বাঘ, বন্য শূকর পর্যন্ত পছন্দ করে।

জলঢোড়া, মেটেলি প্রভৃতি সাপরা প্রধানত মাছ, ব্যাঙাচি ও ছোট ছোট ব্যাঙ খায়। চন্দ্রবোড়া, দাঁড়াশ প্রভৃতি সাধারণত কীটপতঙ্গ, কাঁকড়া, কাঁকড়াবিছা, ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি, পাখি ও ডিম, ইঁদুর খেয়ে থাকে। শঙ্খচূড় ও শঙ্খিনী/শাঁখামুটি প্রধানত সাপই খায়।

এক নজরে বাংলার বিষধর ও নির্বিষ সাপেরা

উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত নির্বিষ ও বিষধর সাপ পাওয়া যায় সেগুলি হল—

নির্বিষ সাপ

সাধারণ বাংলা নাম	সাধারণ ইংরেজি নাম	বিজ্ঞানসম্মত নাম
পুঁয়ে সাপ	Blind Snake	*Typhlops braminus*
হেলে সাপ	Buff striped Keel back	*Natrix stolata*
ঢোঁড়া সাপ	Checkered keel back	*Natrix piscator*
বেত আঁচড়া	Bronze back Tree Snake	*Ahactulla grandocullis*
তিনদাগি সাপ	Copper headed Trinket Snake	*Coelognathus radiatus*
ঘরচিতি	Copper wolf snake	*Olygodon venustus*
তুতুর	Rough scaled sand Boa	*Eryx johnii*
দাঁড়াশ	Rat Snake	*Ptyas mucosus*
ভারতীয় অজগর	Indian Python	*Python molurus*
মেটেলি	Indian Egg Eater	*Elachistodon westermanni*

সামান্য বিষযুক্ত সাপের কামড়ে মানুষ মরে না

লাউডগা	Vine Snake	*Dryophis nasutus*
কালনাগিনী	Flying Snake/ Ornamental Flying Snake	*Chrysopelea ornata*

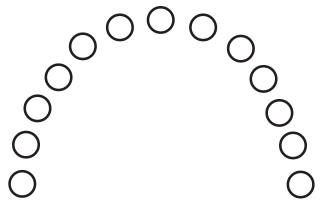
এক ঝলকে বাংলার বিষধর সাপেরা

সাপের চলতি নাম	সাধারণ ইংরাজি নাম (বিজ্ঞান সম্মত নাম সহ)	মারণ মাত্রা (মানুষের ক্ষেত্রে)
১. কেউটে/পদ্ম কেউটে/ আল কেউটে/গেঁড়ি কেউটে দুধরাজ/কলি কেউটে/ ভাঙা তঁপঃ/ফনাক্/ কেউটিয়া প্রভৃতি	Indian Cobra/Monocellate Cobra/Bengal Cobra (*Naja kaouthia*)	১৫ মিঃগ্রাঃ
২. গোখরো/গোক্ষুর/ খড়িশ/গোমা/কালি/ গোখরো/তঁপ/ নাগ	Common Cobra/Spectacled Cobra/Binocellate Cobra (*Naja naja*)	১৫ মিঃগ্রাঃ
৩. শঙ্খচূড়/নাগরাজ	King Cobra (*Ophiophagus hannah*)	১৫ মিঃগ্রাঃ
৪. কালাচ/ডোমনা চিতি/ কাল চিতি	Common Krait (*Bungarus caeruleus*)	২.৫ মিঃগ্রাঃ
৫. শাঁখা মুটি/শঙ্খিনি/ রাজসাপ/মামা ভাগ্নে/ সাকাতি/রাণা সাপ/ সাগিনী/বত্রিশ মুঠি, জলঢোঁড়া/ পানচিতি/ পানি চিতি প্রভৃতি	Banded Krait (*Bungarus fasciatus*)	১০ মিঃগ্রাঃ
৬. চন্দ্রবোড়া/উলুখাড়া/ রক্তছুটে/ কান্দের	Russel's Viper {Daboia = (Vipera) russelii}	৪২ মিঃগ্রাঃ
৭. গেছোবোড়া/সবুজ বোড়া	Green Pit Viper/Pit Viper (*Trimevesurus erythrurus*)	১০০ মিঃগ্রাঃ
৮. সামুদ্রিক সাপ/চঞ্চু সামুদ্রিক সাপ/হুক নাকওয়ালা সামুদ্রিক সাপ	Common Sea Snake/ Beaked Sea Snake/Hook Nosed Sea Snake (*Enhydrina schistosa*)	১.৫ মিঃগ্রাঃ

মন্তব্য : উপরিউক্ত ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৫ ইলাপিডি, ৬-৭ ভাইপেরিডি এবং ৮ নং হাইড্রোপিডি গোত্রের অধীনে পরে।

নির্বিষ ও বিষধর সাপের ক্ষতচিহ্নের পার্থক্য

নির্বিষ কিংবা বিষাক্ত সাপে কামড়ে দিলে ক্ষতস্থানের চিহ্ন দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, সাপটি বিষাক্ত না নির্বিষ এবং সেই বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

নির্বিষ সাপের ক্ষেত্রে	বিষাক্ত সাপের ক্ষেত্রে
নির্বিষ সাপ কামড়ালে ক্ষতস্থানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি দাঁতের সারি সমান্তরালভাবে পাওয়া যায়। স্থানটি সহজে ফুলে ওঠে না।	বিষযুক্ত সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানটি তৎক্ষণাৎ ফুলে উঠবে। ক্ষতস্থানে এক বা দুটি চিহ্ন থাকবে, রক্ত ঝরবে। সঙ্গে আনুষঙ্গিক উপসর্গ তো থাকবেই (যেমন— দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসা, চোখের পাতা বুজে আসা, জিভ আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া, লালা পড়া, বমিবমি ভাব, ঘুমঘুম ভাব প্রভৃতি)। দাঁতের কোনও সমান্তরাল সারি পাওয়া যায় না।
 নির্বিষ সাপের ক্ষেত্রে ক্ষতচিহ্ন	 বিষধর সাপের ক্ষেত্রে ক্ষতচিহ্ন

সাপে কামড়ালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া দরকার—

- ❍ সর্পাহত রোগীকে নড়তেচড়তে দেওয়া উচিত নয়, ক্রমাগত সাহস দিয়ে যেতে হবে।
- ❍ যত দ্রুত সম্ভব একটা আলগা বাঁধন দিতে হবে। হাতে কামড়ালে বাহুর মাঝখানে, পায়ে কামড়ালে উরুর যত ওপরে সম্ভব। তবে, মনে রাখতে হবে বাঁধন দেওয়াটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। বাঁধন দেওয়াটা শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে রোগীকে শক্তি জোগায় মাত্র। বাঁধন দিলেও ২০ মিনিট অন্তর দু-তিন মিনিটের জন্য খুলে দিতে হবে। আবার কোনওমতেই দেড় ঘন্টার বেশি রাখা চলবে না।
- ❍ কামড়ানো জায়গাটা কখনোই কাটা কিংবা চেরা উচিত নয়।
- ❍ ক্ষতস্থান থেকে 'বিষ' টেনে আনার রীতিও বাস্তবে ভুল ও ক্ষতিকারক।
- ❍ কামড়ানো জায়গাটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে হালকা ব্যান্ডেজ বাঁধা যেতে পারে। তারপরেই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে রোগীকে নিকটবর্তী কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। যেখানে এভিএস মজুত আছে।
- ❍ রোগীর কাছে অযথা ভিড় করতে দেওয়া চলবে না। রোগীকে ক্রমাগত আশ্বস্ত করে যেতে হবে যেন তার কিছুই হয়নি।
- ❍ ক্ষতস্থানে দাঁত ভেঙে থাকলে সুতো দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।
- ❍ রোগীকে কিছু খেতে না দেওয়াই ভালো।

সাপের কামড় থেকে বাঁচতে হলে—

- ☆ অন্ধকারে হাঁটাচলা করাবেন না। রাত্রে পথ চলার সময় টর্চ বা আলো ব্যবহার করুন।
- ☆ বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করে নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিন।
- ☆ রাত্রে চলার সময় সম্ভব হলে পা ঢাকা জুতো ব্যবহার করুন।
- ☆ ঘরে বা বাড়ির চারপাশে গর্ত দেখলে বন্ধ করে দিন।
- ☆ শোবার ঘরের কাছাকাছি হাঁস-মুরগির ঘর রাখবেন না।
- ☆ গুল, ঘুঁটে ও বিচুলির গাদায় হাত দেওয়ার সময় সতর্ক থাকবেন এবং ভালো করে দেখে নেবেন।
- ☆ শোবার সময় বিছানা পরিষ্কার করে ভালোভাবে দেখে নিন এবং মশারি ব্যবহার করুন।
- ☆ রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ☆ ওঝা, গুণিনদের প্রতি নির্ভরতা কমান।
- ☆ মেঝেতে না শোয়াই ভালো। মশারিসহ খাট বা খাটিয়া বা চৌকি পেতে শোবেন।
- ☆ ঘাস-জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।
- ☆ মাঠে-ঘাটে প্রাকৃতিক কোনও কাজ বা অন্য কোনও কাজ করতে যাওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।
- ☆ হঠাৎ করে সাপের সামনাসামনি পড়ে গেলে পারতপক্ষে নড়াচড়া না করাই ভালো। কারণ, স্থির কোনও কিছুকে সাপরা সাধারণত আক্রমণ করে না। পরে অবস্থা বুঝে সাবধানে যেতে হবে।

সাপ দেখলে কী করবেন?

- ✶ অযথা সাপটিকে উত্যক্ত করবেন না। অতিরিক্ত সাহস দেখানো ঠিক নয়।
- ✶ সাপটি আমাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে এবং বসতি এলাকায় না থাকলে সাপটিকে নিয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানো উচিত নয়।
- ✶ নির্বিষ কোনও সাপ থাকলে অযথা ভয় বা আতঙ্কের কিছু নেই, বরং যেখানে আছে (বসত এলাকা ছাড়া) সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত।
- ✶ তবুও প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলে এলাকার বন বিভাগ কিংবা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সাপ সংরক্ষণ করা কেন জরুরি?

- ✶ প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং জীবের খাদ্যশৃঙ্খল রক্ষার ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।
- ✶ সাপের বিষ থেকেই বিষাক্ত সাপের কামড়ের একমাত্র অব্যর্থ ওষুধ অ্যান্টিভেনাম সিরাম বা এভিএস তৈরি হয়।
- ✶ এছাড়া পেশিসংক্রান্ত, বেদনানাশক, স্নায়বিক বিভিন্ন রোগ, মানসিক রোগ, মেনিনজাইটিস, হিমোফিলিয়া, দাঁতের গোড়া থেকে রক্তক্ষরণ, রেটিনা ও জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ রোধে এবং কলেরা, টিউমার জাতীয় রোগের প্রতিষেধক হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।
- ✶ ইঁদুর জাতীয় পেস্ট বা পরোক্ষে ফসলের ক্ষতি করে, প্লেগ ও লেপ্টোস্পাইরাল জন্ডিসের মতো বিভিন্ন মারণ রোগে আমাদের প্রভূত ক্ষতি করে, তাদের দমন করে আমাদের উপকার করে।
- ✶ সাপকে নিয়ে এরকম অজস্র গল্প-গাথা এবং ভ্রান্ত ধারণা সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এগুলি থেকে দূরে থাকুন। কুসংস্কার থেকে সাবধানে থাকুন। বাস্তববাদী হোন।

আপনি জানেন কি?

- ✶ সাপ দুধ খায় না।
- ✶ সাপ বধির, কানে শুনতে পারে না... কাজেই বাঁশুরির তালে নাচাও মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়।
- ✶ সাপের কোনও মণি হয় না।
- ✶ বিষাক্ত সাপের কামড়ে (মারণ মাত্রা) ওঝা গুণিনদের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই।
- ✶ কোনও উড়ুক্কু সাপ হয় না প্রভৃতি।

বিঃ দ্রঃ— পরিবারের উপার্জনশীল কর্তাব্যক্তি সাপের কামড়ে মারা গেলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে পঞ্চায়েত ও পৌরসভা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে Vide G.O. No. 1482(40)-FR/AP-3/04 dtd 07/08/2008

বিষধর সাপ ও কামড়ের চিহ্ন ৩য় প্রচ্ছদে রঙিন ছবি দেখুন

জলপাইগুড়ি সায়েন্স এ্যান্ড নেচার ক্লাব-এর পক্ষে ড. রাজা রাউত কর্তৃক প্রচারিত।
যোগাযোগ : ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, ৯২৩২৩৮৭৪০১, ৯৮৩২০৪৯৫৭৩

ত রু ণ রা য় চৌ ধু রী

জলের নিচে ছুটে যায় রেল

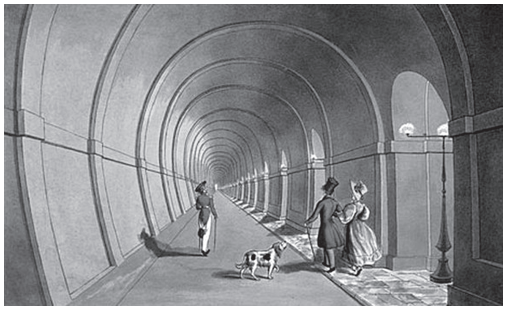
অবশেষে জলের নিচ দিয়ে রেলপথ চালু হল ভারতে। এই নিয়ে মানুষের উদ্দীপনার শেষ নেই। এতদিন গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতা থেকে হাওড়া যাওয়ার জন্য ছিল জলপথ ও রবীন্দ্র সেতু। যানজটের কারণে সময়ও লাগত অনেক। এখন লাগে মাত্র ৪৫ সেকেন্ড। রেলপথের জন্য গঙ্গার নিচে তৈরি হয়েছে দুটি সুড়ঙ্গ। একটি যাওয়ার, আর অন্যটি ফেরার।



লন্ডনে টেমসের নিচ দিয়ে এধরনের রেলপথ প্রথম স্থাপিত হয় ১৮৪৩ সালে। স্থপতি ছিলেন ফ্রান্সের মার্ক ইসামবার্ড ব্রুনাই। শোনা যায় মাটির নিচে একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৩০ সালে। ১ কিলোমিটার দীর্ঘ সেই সুড়ঙ্গের অবস্থান গ্রিসের সামোস দ্বীপে। স্থপতির নাম ছিল ইউপ্যালিনোস ডি মেগারা। তবে সেই সুড়ঙ্গটি ব্যবহার করা হত ক্রেটোস পাহাড়ের এক পার থেকে অন্য পারে পিথাগোরিও শহরে জল সরবরাহের কাজে। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ইউপ্যালিনোসের সুড়ঙ্গটি তৈরি করতে ক্রীতদাসদের কাজে লাগানো হয়েছিল। হাতুড়ি ও ছেনির সাহায্যে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শুরু হয় দুই প্রান্ত থেকে। সুড়ঙ্গের দেওয়াল যাতে খাড়া থাকে সেটা বোঝার জন্য ছিল গোনিওমিটার। অভিমুখ ও ঢাল ঠিক আছে কিনা তা দেখা হত যথাক্রমে ডায়োপট্রা ও করোবেটস যন্ত্র দিয়ে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮৬ সাল থেকে সুড়ঙ্গের সাহায্যে খনি থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করার কথা শোনা যায় মিশরে। রোমানরাও সুড়ঙ্গ তৈরির ব্যাপারে বেশ পারদর্শী ছিলেন। ১৮ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের ডার্বিশায়ারে তৈরি হয় ফ্রিচলে-টানেল। চুনাপাথরের মধ্য দিয়ে সেই সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছিল একটি সীসা খনি থেকে জল বের করার জন্য। ১৭৯৩ সালে একই নামে সেই দেশে তৈরি হয় একটি রেল সুড়ঙ্গ। অনেকদিন ধরে সেটি দিয়ে ডার্বিশায়ার থেকে নটিংহামশায়ারে রেল চলাচল করত। নাতনিকে চিঠি লিখে ব্রুনাই জানান একবার তিনি কোনো একটি জাহাজের জলে ডুবে থাকা কাঠের খোলসের অংশে সামুদ্রিক কীটের তৈরি করা গর্ত দেখতে পান। তখনই তাঁর মাথায় আসে যাতায়াতের জন্য নদীর নিচে সুড়ঙ্গ তৈরির কথা।

সুড়ঙ্গ তৈরি করা রীতিমত ঝুঁকির ব্যাপার। সুড়ঙ্গের ছাদ যাতে ভেঙে না পড়ে প্রাচীনকালে তারজন্য ব্যবহার করা হত কাঠের খুঁটি ও বিম। নদীর নিচে নিরাপদে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার জন্য ব্রুনাই আবিষ্কার করেন নলাকার টানেল-শিল্ড। কাস্ট আয়রনের সেই শিল্ডে ছিল ৩৬টি প্রকোষ্ঠ যেগুলো তৈরি হয়েছিল কাঠের তক্তা দিয়ে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একজন শ্রমিক। একইসঙ্গে চলে খোঁড়া ও মাটি সরানোর কাজ। সুড়ঙ্গ কিছুটা খোঁড়া হলে



হাইড্রলিক জ্যাকের সাহায্যে সামনের দিকে এগিয়ে যায় টানেল-শিল্ড। দৃঢ়ভাবে স্থাপনের পর সেটির পেছনদিকে চলে গাঁথনির কাজ। এই কাজের জন্য দরকার ইট ও পাথর। ইটগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে সেগুলো পরস্পরের সাথে সুন্দরভাবে লেগে থাকে। জল যাতে কোনভাবেই না ঢোকে তাই গাঁথনির আগে সুড়ঙ্গের দেওয়ালে গ্রাউট লাগানো হয়। গ্রাউটে থাকে জল ও সিমেন্টসহ আরো নানা উপাদান।

টেমস টানেলের দেওয়াল ও গাঁথনির মাঝে রয়েছে জল নিরোধক স্তম্ভ বা ওয়ে-পিলার। কাদা ও খড়িমাটি দিয়ে এই ধরনের স্তম্ভ তৈরির জন্য বানানো হয়েছিল বিভিন্ন আকৃতির ছাঁচ। দুটি ওয়ে-পিলারের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই বললেই চলে। টেমস টানেলের ভেতর খিলানযুক্ত অন্য কোনো স্তম্ভ নেই। তবে সঠিক বেধ (thickness) জানা না গেলেও সেই ওয়ে-পিলারগুলোর ভারবহন ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। নদীর জল ঢুকে যাওয়ায় বেশ কয়েকবার টেমস টানেল তৈরির কাজ ব্যহত হয়। এছাড়াও ছিল নরম মাটির সমস্যা। শ্রমিকদের অসীম ধৈর্য ও দক্ষতায় সমস্ত বাধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। এই টানেল তৈরি হতে সময় লাগে দীর্ঘ ১৮ বছর।

ধীরে ধীরে ব্রুনাইয়ের টানেল শিল্ড বদলে যায় টিবিএম বা টানেল-বোরিং-মেশিনে। ১৯৫৬ সালে জেমস রবিন্সের তৈরি এইধরনের মেশিনের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাথরের মধ্যে সুড়ঙ্গ খোঁড়া ও মাটি সরানো সম্ভব হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় টিবিএম-এর ব্যবহার শুরু হয়। প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে মেশিনের দৈর্ঘ্য। সাধারণত এই মেশিনের দৈর্ঘ্য ৫০ থেকে ১৪৯ মিটার হয়ে থাকে। কোনো কোনো মেশিনের ব্যাস হয় ১৭ মিটারেরও বেশি। টিবিএম-এর সামনে থাকে শিল্ড। দৈর্ঘ্যে সেটি ব্যাসের সমান। সুড়ঙ্গ তৈরির জন্য প্রথমে খুঁড়ে নিতে হয় নির্দিষ্ট গভীরতার দুটি বিশাল গর্ত। সেই গর্তগুলো থেকেই সুড়ঙ্গ খুঁড়তে খুঁড়তে শিল্ড মাটির ভেতর প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্ডের পেছনদিকে সুড়ঙ্গের দেওয়ালে একের পর এক লেগে যায় কংক্রিটের রিং। জল আটকানোর জন্য সুড়ঙ্গের দেওয়াল ও রিংয়ের মাঝে লাগানো হয় গ্রাউট। এছাড়াও সুড়ঙ্গকে মজবুত করতে ব্যবহার করা হয় পাথরের টুকরো, বালি, মাটি, ফ্লাই-অ্যাশ, ফোম-কংক্রিট, পলিথিন, পলিয়েস্টার, পিভিসি, ফাইবার-গ্লাস ইত্যাদি।

আধুনিক টানেল বোরিং মেশিনে থাকে কম্পিউটার ও সেন্সর। খুব সূক্ষ্ম ভাবে সুড়ঙ্গ তৈরী এখন খুব সহজ। সময়ও লাগে কম। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার নিচে নিঃশব্দে কাজ করতে করতে এগিয়ে চলে মেশিন। উপর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ইতিমধ্যে জলের নিচে রেলপথ তৈরি হয়েছে পৃথিবীর আরো অনেক জায়গায়। জলের নিচে পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথটি জাপানের সাইকান টানেল। লন্ডন থেকে ইউরোপের নানা জায়গায় উচ্চ গতিসম্পন্ন রেল চলাচল করে ইংলিশ চ্যানেলের নিচে চ্যানেল-টানেলের মধ্য দিয়ে। রেলে নেদারল্যান্ডস থেকে বেলজিয়াম যাওয়ার জন্য রয়েছে কানাল-টানেল। এই প্রসঙ্গে এসে যার তুরস্কের মারমারে-টানেলের কথা। আমাদের দেশে গঙ্গার নিচে রেলপথ সেসবের মধ্যে একটি নবতম সংযোজন।

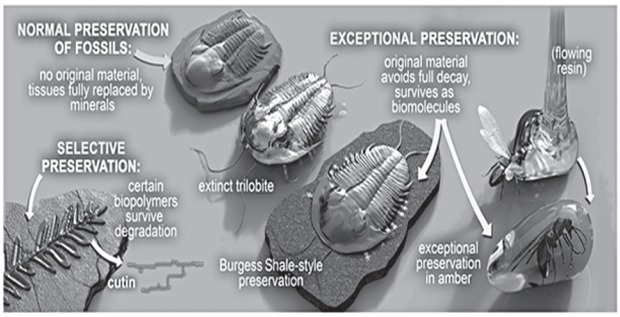
লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: tarunroyc15@gmail.com • M. 9231835703

ক ম ল বি কা শ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য-জীবাশ্ম





পৃথিবী বা সৌরজগতের সৃষ্টি লগ্নে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। সে সময় এই সবুজ গ্রহের চেহারাটাই ছিল অন্যরকম। ধীরে ধীরে সেই চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। একদা রুক্ষ, শুষ্ক গ্রহটিতে দেখা দেয় সবুজের সমারোহ। আর তারই মাঝে বিচরণ করতে দেখা যায় প্রাণীকুলকে। ছোট বড়ো কত রকমের জীব যে আছে এই পৃথিবীতে তার ইয়ত্তা নেই। নানা বৈচিত্রে ভরা এইসব জীবনের উৎপত্তি ও পরিণতি নিয়ে জিজ্ঞাসার যেন শেষ নেই। জীবজগতের সৃষ্টির কাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু জীবের যেমন বিলোপ হয়েছে তেমনি বিবর্তনের পথ ধরে বিকাশ ঘটেছে অনেক নতুন জীবের। যারা আজ পর্যন্ত বহু জীবের যেমন বিলোপ হয়েছে তেমনি বিবর্তনের পথ ধরে বিকাশ ঘটেছে অনেক নতুন জীবের। যারা আজও টিঁকে আছে তাদের আমরা চোখে দেখতে পাই। তাই তাদের সম্পর্কে জানা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু যারা আজ আর নেই, হারিয়ে গেছে বহুদিন আগে তাদের সম্পর্কে জানার উপায় কী। বিজ্ঞানীদের মতে এইসব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জীবের ইতিহাস জানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় এদের জীবাশ্ম বা ফসিল (fossil)। জীবজগতের প্রাচীন ইতিহাস জানতে জীবাশ্ম তাই আজ জীববিজ্ঞানীদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছর আগেকার কোনো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জীবরে আকৃতি, স্বভাব, উৎপত্তি ও স্থায়ীত্বকাল ইত্যাদি সবই জানতে সাহায্য করে এই জীবাশ্ম। তাই জীবাশ্মবিজ্ঞান আজ বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা। বিজ্ঞানের এই শাখায় আলোচনার মূল বিষয়ই হল প্রস্তরীভূত জীবদেহ বা জীবাশ্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জীবাশ্ম নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। আর সেই গবেষণার ফলস্বরূপ মাঝে মাঝেই পালটে যাচ্ছে অতীত ইতিহাসের ধ্যানধারণা।

জীবাশ্মকে সাধারণত দু-ভাগে ভাগ করা যায়—মেগা জীবাশ্ম (Mega Fossil) এবং মাইক্রো জীবাশ্ম (Micro Fossil)। মেগা বা মাইক্রো যে ধরনের জীবাশ্মই হোক না কেন, এদের পাঁচটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়:

১. **জীবিত জীবাশ্ম গোষ্ঠী** (Life assemblage fossil): কোনো অঞ্চলে কোনো জীবের মৃত্যু হলে মৃত জীবটি যদি সেখানেই প্রস্তরীভূত অবস্থায় ও যদি সেটার কোনো রকম স্থান পরিবর্তন না হয় তবে সেই জীবাশ্মকে জীবিত জীবাশ্ম বলা হয়।

২. **মৃত জীবাশ্ম গোষ্ঠী** (Death assemblage fossil): যদি কোনো জীব মৃত্যুর পর স্থানান্তরিত হয়ে প্রস্তরীভূত হয় বা হওয়ার পর স্থানান্তরিত হয় তবে সেই জীবাশ্মকে বলা হয় মৃত জীবাশ্ম।

৩. **মিশ্র-মৃত জীবাশ্ম গোষ্ঠী** (Mixed Death assemblage fossil): যখন জীবিত ও মৃত জীবাশ্ম গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটে তখন সেই জীবাশ্মকে মিশ্র-মৃত জীবাশ্ম বলা হয়।

৪. **সূচক জীবাশ্ম** (Index Fossil): প্রস্তরীভূত জীবদেহ যদি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ থাকে অর্থাৎ, সেটার দেহ-কাঠামো যদি শক্তসমর্থ এবং বেশ স্পষ্ট থাকে তবে সেই জীবাশ্মকে সূচক জীবাশ্ম বলে।

৫. **মেকি জীবাশ্ম** (Pseudo Fossil): অনেক সময় গাদ বা খনিজ লবণের তলানি থেকে জীবাশ্মের মতো দেখতে এক ধরনের প্রতিকৃতি তৈরি হয়। এগুলি প্রকৃত জীবাশ্ম নয়। এই ধরনের জীবাশ্মকে মেকি জীবাশ্ম বলে।

জীবাশ্ম তৈরি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রভাবক

জীবাশ্ম যে কোনো পরিবেশে তৈরি হয় না। এর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবেশের প্রয়োজন হয়। জীবাশ্ম সৃষ্টির জন্য সাধারণত নিম্নোক্ত প্রভাবকগুলির (Factors) প্রয়োজন হয়—

* মৃত্যুর পর জীবের পুরো দেহ বা অংশবিশেষ মাটিতে, কাদা বা পলির মধ্যে, স্থির জলের ভিতরে থাকা দরকার।
* জীবাণুর অবস্থান বা জীবাণু দ্বারা বিয়োজন ক্রিয়া প্রতিহত হতে হবে।
* অক্সিজেনের উপস্থিতি খুব কম হওয়া দরকার।
* উপযুক্ত চাপ ও তাপ আবশ্যক।
* প্রচুর খনিজ পদার্থ থাকা দরকার যাতে প্রয়োজনানুসারে তা মৃতদেহে সঞ্চারিত হতে পারে।
* বাতাস বা প্রবহমান গ্যাসের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকা প্রয়োজন।

জীবাশ্মের শ্রেণিবিভাগ

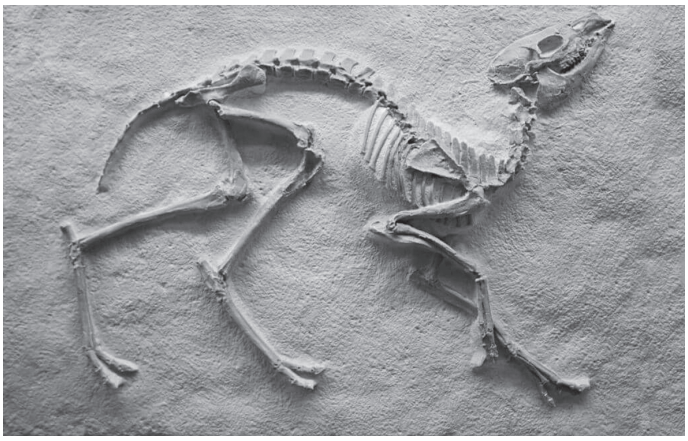
জীবাশ্ম গঠনের প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে জীবাশ্মকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

১. **ছাঁচ জীবাশ্ম:** কোনো পাললিক মৃত্তিকাস্তর শিলায় রূপান্তরিত হওয়ার আগে যদি সেখানে কোনো মৃত জীবদেহ সঞ্চিত থাকে তবে জীবদেহটি নষ্ট হয়ে গেলেও তার একটা ছাপ শিলার গায়ে থেকে যায়। এই ধরনের জীবাশ্মকে ছাঁচ জীবাশ্ম বলা হয়। সাধারণত বিভিন্ন উদ্ভিদ মূলের জীবাশ্ম এই ধরনের হয়।

২. **ছাপ জীবাশ্ম:** নরম পলি বা কাদা মাটি যখন শিলায় পরিণত হয় তখন সেখানে মৃত জীবদেহ থাকলে তার একটি ছাপ শিলীভূত মাটির গায়ে থেকে যায়। এই ধরনের জীবাশ্মকে ছাপ জীবাশ্ম বলা হয়। সাধারণত গাছের পাতা, ফল, কাণ্ড, মূল ইত্যাদির জীবাশ্ম এই ধরনের হয়।

৩. **সংনমন জীবাশ্ম:** তাপ ও চাপের প্রভাবে যখন কোনো মৃত জীব স্তরীভূত মৃত্তিকা মধ্যে প্রস্তরীভূত হয় তখন তাকে সংনমন জীবাশ্ম বলে।

৪. **অশ্মীভূত জীবাশ্ম:** কোনো মৃত দেহ নষ্ট হওয়ার সময় যদি তাতে খনিজ পদার্থ (সিলিকা, ফেরাস সালফাইড, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট ইত্যাদি) সঞ্চারিত হয় এবং সেই মৃত দেহ বা দেহের অংশ বিশেষ প্রস্তরীভূত হয়ে জীবাশ্মে পরিণত হলে তাকে



অশ্মীভূত জীবাশ্ম বলে। কাঠের ফসিল এই ধরনের জীবাশ্ম।

৫. **অ্যাম্বার জীবাশ্ম:** উদ্ভিদের ক্ষরিত রজন পাথরের খাঁজে জমে যখন ধীরে ধীরে শিলায় পরিণত হয় তখন তাতে ফুল, ফুলের রেণু, নানা ধরনের পতঙ্গ জীবাশ্ম রূপে সঞ্চিত থাকে। এই ধরনের জীবাশ্মকে অ্যাম্বার জীবাশ্ম বলে।

জীবাশ্মের বয়সকাল নির্ণয় পদ্ধতি :

জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ের জন্য যেসব পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি দুটি বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

* **কার্বন পদ্ধতি:** গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে তেজস্ক্রিয় কার্বনের পঞ্চাশ শতাংশ সাধারণ কার্বনে রূপান্তরিত হতে সময় নেয় মোটামুটি ৫৭৬০ বৎসর। এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে কোনো জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় আধুনিককালে বিজ্ঞানীদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য। কোনো জীবাশ্মের তেজস্ক্রিয় কার্বন এবং সাধারণ কার্বনের অনুপাত থেকে জীবাশ্মের বয়সকাল নির্ণয় করা শুধু সহজই নয়, নির্ভরযোগ্যও।
* **তেজস্ক্রিয় ঘড়ি পদ্ধতি:** এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির নির্দিষ্ট ধাতুতে রূপান্তরিত হওয়ার সময়কালকে কাজে লাগানো হয়। যেমন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়ামের এক শতাংশ সাধারণ ধাতুতে পরিণত হতে সময় নেয় প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ বছর। এই রূপান্তরের সময় পরিমাপের একককে বলা হয় অর্ধ আয়ু বা হাফলাইফ। এই পদ্ধতিতে ইউরেনিয়ামের পরিবর্তে অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থে (রেডিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি) পরিবর্তনের সময়কালকেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী বোল্টউড এই পদ্ধতিটির উদ্ভাবক। তাঁর মতে এই পদ্ধতিতে জীবাশ্মের বয়সকাল নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

জীবাশ্মের উপযোগিতা

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে জীবাশ্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীতে রাজত্ব করতে ডায়ানোসারের দল। একথা আমরা জানতেই পারতাম না যদি না মাটি খুঁড়ে ওই অতিকায় জন্তুগুলির জীবাশ্ম আবিষ্কার হত। জীবাশ্ম যেমন প্রাচীন ইতিহাস জানতে সাহায্য করে তেমনি শিল্প কারখানায় ও প্রাত্যহিক জীবনেও কাজে লাগে। তাই মানবজীবনে জীবাশ্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নীচে জীবাশ্মের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য উল্লেখ করা হল।

* জীবাশ্মের মাধ্যমে জানা যায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর আগেকার ইতিহাস।
* সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কয়লা, গ্রাফাইট, অ্যাম্বার, চুনাপাথর প্রভৃতি জীবাশ্ম বা জীবাশ্মজাত বস্তু। জীবাশ্মের সাহায্যে এক স্থানের শিলাস্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়।
* আপেক্ষিক ভূতাত্ত্বীয় সময় নির্ধারণ করার জন্য জীবাশ্মের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
* অতীতের ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়া কেমন ছিল তা জানার জন্য জীবাশ্মকে কাজে লাগানো যেতে পারে।
* জীবাশ্মের মাধ্যমে প্রাণের বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা সম্ভব।
* বিবর্তনের ইতিহাস লুকিয়ে আছে এই জীবাশ্মের মধ্যেই।
* জীবাশ্ম একদিকে যেমন অতীতের সাক্ষ্য তেমন অতীত ও বর্তমানের সংযোগকারী সেতু।

জীবাশ্ম হল মাটি চাপা জ্ঞানের ভাণ্ডার। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এর থেকে শুধু খুঁজে নিতে হবে প্রকৃত সত্যকে। আগামীদিনে জীবাশ্ম থেকেই হয়ত উন্মোচিত হবে বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত।

তথ্যসূত্র

Wikipedia:
https://en.wikipedia.org>wiki>fossil
https://www.britannica.com>science>fossil
https://www.nature.com>news feature

লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: kbb.scwriter@gmail.com • M. 9433145112

প্রবীর বসু

পোকা-মাকড়ের দাম্পত্য জীবন



প্রজাপতি



মশা



উচ্চিংড়ে

প্রায় ৬০ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে প্রাণ বিরাজ করছে। লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসতি পৃথিবীর জলে ও স্থলে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে পোকারা এই জগতে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু কিভাবে? উত্তর একটাই—বংশবিস্তার। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি প্রাণীর আয়ু নির্ধারিত এবং সীমাবদ্ধ। তাই সে প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে রেখে চলেছে তার উত্তরাধিকার। আর এই প্রজননের ক্ষেত্রে প্রয়োজন স্ত্রী ও পুরুষ এবং সে এককোষী অ্যামিবা থেকে সর্বোন্নত মানুষ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আবার যে কোনও প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পারস্পরিক আকর্ষণ। স্ত্রী-পুরুষের শাশ্বত প্রেমের আকর্ষণেই প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হয়ে চলেছে উত্তরাধিকার।

মানব সমাজে প্রেম নিবেদনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নানাভাবে। সরাসরি কথা বলে, চিঠি লিখে, চোখের ভাষায় তার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে। ঠিক একইরকমভাবে পোকা-মাকড়, কীটপতঙ্গ যতই তুচ্ছ হোক তারাও ভাসে প্রেমের জোয়ারে। কীটপতঙ্গদেরতো কথা বলার স্বরযন্ত্র নেই। আর বললেও তা শুনবে কি করে তাদের তো শোনবার মতো কানও নেই। তাই তারা কেউ ডানা নাড়িয়ে, পেশি কাঁপিয়ে, কেউ শরীরের দুটো অংশের মধ্যে ঘষাঘষি করে শব্দ তৈরি করে। নানা কম্পাঙ্কের, নানা সুরের সেই শব্দই ওদের গান। এবার বলতে হয় কানের কথা। পতঙ্গদের শ্রবণ অনুভূতি গ্রহণের জন্য রয়েছে একটি অনুভূতি গ্রাহক কোষ এবং একটি স্নায়ুতন্ত্র। সেনসিলা নামের এই ছোট্ট অঙ্গটি বাতাসের কম্পন, স্পর্শ ও অভিকর্ষের অনুভূতি গ্রহণে সক্ষম। বহু শুঁরওয়ালা পতঙ্গের শুঁড়ের মাথায় থাকে এই সেনসিলা। কোনও কোনও পতঙ্গের লেজে অবস্থিত তন্তুতেও থাকে। আবার কারও ডানার নিচে থাকে **টিমপ্যানাম** নামের একরকম পর্দা যা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আমাদের সবার খুব পরিচিত। সাধারণত সূর্যাস্তের পর ঝিঁঝিঁ পোকারা উচ্চস্বরে গান জুড়ে দেয়। তবে এদের গানের উৎস ডানা। এরা এদের শক্ত ডানার পারস্পরিক ঘর্ষণে শব্দ তৈরি করে। এই শব্দ হয় একটানা একই সুরে। একজাতীয় **ঘাসফড়িং** একইভাবে বিভিন্ন ধরনের শব্দ তৈরি করতে পারে।

ফড়িং, ছারপোকা, প্রজাপতি ও মথেরা আবার পেশির সাহায্যে বিশেষ পর্দা কাঁপিয়ে শব্দ তৈরি করে। **রানী মৌমাছি** তার বুক অংশের খোলক (স্ক্লোরাইট)-এর কম্পনে **শিসধ্বনি** উৎপন্ন করে। আবার গুবরে পোকা দ্রুত মাথা ঠুকে শব্দ সৃষ্টি করে। কত বিচিত্র এই শব্দসৃষ্টির কৌশল। তবে এইসব শব্দতে তীক্ষ্ণতা থাকলেও সুরের অভাব প্রকট।

মানুষের কানে পোকাদের গান যতই বেসুরো লাগুক, পোকাদের কাছে এই গান প্রেম নিবেদনের আহ্বান। ঝিঁঝিঁ পুরুষদের স্বরের ঘায়ে ঝিঁঝিঁ রমণীদের তো মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। স্ত্রী ঝিঁঝিঁরা কোনো শব্দ সৃষ্টি করতে পারে না। পুরুষ ঝিঁঝিঁরা সাধারণত তিন ধরনের গান গায়। প্রাথমিক গানে একটি পুরুষ ঝিঁঝিঁ স্ত্রী ঝিঁঝিঁকে জানান দেয় এই এলাকাটার মালিক সেই। এই গান শোনানো হলে শুরু হয় দ্বিতীয় গান। এই গানের মধ্য দিয়ে সে স্ত্রী **ঝিঁঝিঁর পাণি প্রার্থনা** করে। এই গান শুনে স্ত্রী ঝিঁঝিঁর অনুরাগ বেড়ে যায়। ফলে প্রেম পাগল স্ত্রী ঝিঁঝিঁ মিলন প্রয়াসে এগিয়ে যায় পুরুষের দিকে। এই দৃশ্য দেখে পুরুষ ঝিঁঝিঁ তৃতীয় গান শুরু করে। এই গান অন্য পুরুষদের প্রতি বার্তা—খবরদার, কেউ ধারেকাছে থাকবে না এই সময়। তফাৎ যাও।

সিকাডা এক জাতের পোকা তাদের আকার বেশ বড়। বনেজঙ্গলে বেশি থাকে। এদের শৈশব বা নিম্পদশার স্থায়িত্ব অনেক বেশি। তেরো থেকে সতেরো বছর থাকে মাটির তলায়। কিন্তু পূর্ণতা পাওয়ার পর আয়ু মাত্র কয়েক সপ্তাহ। কীটপতঙ্গের জগতে গায়ক হিসেবে এদের খুব নাম-যশ। সিকাডা সমাজে গায়কই হয় গায়িকা হয় না। কারণ কোনও স্ত্রী সিকাডা শব্দ সৃষ্টি করতে পারে না। তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে পাহাড়ি অঞ্চলে যারা বেড়াতে যান তারা জানেন সিকাডাদের সমবেত সঙ্গীত কতখানি তীব্র। কানে তালা লাগার জোগাড় হয়। তবে সব **সিকাডার** গান একরকম হয় না। কোনও প্রজাতির গান খ্যাসখেসে কর্কশ আবার কোনো প্রজাতির গান তীক্ষ্ণ কিন্তু শ্রুতিমধুর। পুরুষ সিকাডাদের সমবেত সঙ্গীতের সময় স্ত্রী সিকাডা উড়ে এসে মাঝখানে বসে এবং ডানা ঝাপটে টিক টিক করে শব্দ করে। পুরুষ সিকাডারা টিক টিক শব্দের সঙ্গে স্ত্রী সিকাডার দিকে এগিয়ে আসে এবং যে পুরুষ সবার আগে স্ত্রী সিকাডার কাছে পৌঁছয় সেই তার সাথে মিলনের সুযোগ পায়।

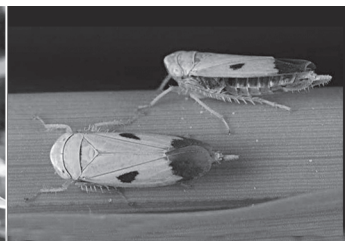
কাঠকাটা একপ্রকার গুবরে পোকার স্ত্রীরা আবার গান গায়। গান শুনে পুরুষ গুবরে কাঠের ভেতর গর্ত করে বাসরঘর তৈরি করে। স্ত্রী গুবরে মিলন কামনায় বাসরঘরের সামনে কিচিরমিচির গান জুড়ে দেয়। গান শুনে বাসরঘর থেকে পুরুষ গুবরে বেরিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তারপর বাসরঘরে তারা দুজনে একবারই মিলিত হয়।

স্ত্রী গন্ধিপোকা আবার পুরুষদের আকর্ষণ করবার জন্য **ফেরোমেন** নামক একপ্রকার উদ্বায়ী হরমোন নিঃসরণ করে। এদিকে পুরুষ গন্ধিপোকাও কর্কশ স্বরে স্ত্রীদের মনযোগ আকর্ষণ করবার জন্য গান জুড়ে দেয়। ফেরোমেনের গন্ধে বার্তা থাকে স্ত্রী পোকা মিলনে ইচ্ছুক, নাকি অনিচ্ছুক?


গুবড়েপোকা


মশা


সিকাডা


শ্যামাপোকা

যদি সে বোঝে স্ত্রী পোকা মিলনে ইচ্ছুক। তখন পুরুষ পোকাটি গান ধরে, তবে সে গান প্রেমের নয় সতীর্থদের ধারেকাছে না ঘেষার বার্তা। তারপর তারা মিলিত হয়।

আফ্রিকার এক জাতের পুরুষ ড্রোসোফিলা স্ত্রীর সাথে মিলনের সময় পুরো সময় ধরেই গান গায়। তবে মিলনের সময় স্ত্রী ড্রোসোফিলা গান বন্ধ করে দেয় এবং তার ডানা জোড়া ভি আকৃতির মতো খাড়া করে তুলে ধরে।

মশাদের গুনগুন শব্দ সকলের চেনা। ডানার কম্পনে সৃষ্ট এই শব্দ। তবে এই গুঞ্জনেও থাকে প্রেমের আহ্বান। পুরুষ এডিস এই গুঞ্জনের শব্দে উত্তেজিত বোধ করে। আসলে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী এডিসের গুঞ্জন পুরুষ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী এডিসের গুঞ্জন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তবে সদ্যোজাত স্ত্রী মশাদের গুঞ্জন সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় কোনও পুরুষ মশাই তাদের পিছু নেয় না।

চারিদিকে এত চিৎকার এত কোলাহলের মধ্যেও হাজার হাজার প্রজাতির কীটপতঙ্গ প্রেমসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে যেভাবে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে খুঁজে নেয় তা সত্যিই আশ্চর্যের। আরও আশ্চর্যের এই গান কেউ শোখায় না। সবই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, বংশগত। লক্ষ কোটি বছর ধরে এভাবেই তারা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গেয়ে চলেছে প্রেমসঙ্গীত। আমরা মানুষরা কি শুনলাম, সে বিষয় তাদের বিচার্য নয়।

লেখক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: prabirchandrabasu54@gmail.com • M. 9830676330

আ বু হা নি ফ শে খ

বড়ো বিড়াল



আপনি ঠিকই ধরেছেন "বড়ো বিড়াল" অর্থাৎ জাগুয়ারের কথা। জাগুয়ার শব্দটি ব্রাজিলের একটি দেশীয় শব্দ "আইগুয়ারা" থেকে এসেছে। যার অর্থ হল নেকড়ের চেয়েও বড় বুনো দাগযুক্ত বিড়াল। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম হল *Panthera onca*. বর্তমানে চারটি প্যানথেরার মধ্যে বন বিড়াল হল একটি, অন্য তিনটি হল বাঘ, সিংহ এবং চিতাবাঘ। জাগুয়ার, চিতা এবং চিতাবাঘের মতই গায়ে ছাপওয়ালা। তবে জাগুয়ার এদের থেকে বড়ো, বলিষ্ঠ এবং অনেক শক্তিশালী হয়। একটি পুরুষ জাগুয়ারের ওজন প্রায় ৫৬-৯৬ কেজি হয়। আর একটি স্ত্রী জাগুয়ারের আকার পুরুষ জাগুয়ারের তুলনায় প্রায় দশ গুন ছোট হয়। এদের ওজন প্রায় ৬৩ কেজি হয়ে থাকে। একটি বড়ো বিড়াল নাক থেকে লেজ পর্যন্ত ৪৫-৭৫ সেন্টিমিটারে দৈর্ঘ্যে হয়।

আমাদের দেশে এদেরকে বনখটাশ, অ্যারিজোনা, বনচিতা, কালো চিতা ইত্যাদি নামেও জানি। এরা সাদা, কালো এবং গোলাপী রঙের হয়ে থেকে। প্রাণী জগতে সবচেয়ে নির্মম শিকারী প্রাণীটি হল জাগুয়ার। জাগুয়ার মূলত আমেরিকার মহাদেশীয় ভূখন্ডে পাওয়া যায় (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো, পেরু ও ব্রাজিল)। এছাড়া আমাজন রেইন ফরেস্ট, দক্ষিণ প্যারাগুয়ে এবং উত্তর আর্জেন্টিনা।

জাগুয়ার মূলত নিশাচর। তবে এরা ভোর এবং সন্ধ্যের সময় স্যাঁতসেঁতে বনভূমির উন্মুক্ত খোলা জাগায় থাকতে বেশি পছন্দ করে। এদের প্রিয় খাবার হল কুমির ক্যাপিবায়ো, বানর, কচ্ছপ, সাপ, বন্য শূকর এছাড়া তাদের থেকে ছোট প্রানীগুলিকে খেয়ে থাকে। জাগুয়ার গভীর জলে সাঁতার কেটে শিকার ধরতে খুব অভ্যস্থ।

১৯৩৯ সালে, রেজিনাল্ড ইনস পকক ভৌগোলিক স্থান এবং তাদের মাথার খুলির উপর ভিত্তি করে ৮টি উপ-প্রজাতি নমুনা সংরক্ষণ করেন এবং ২০০৪ সালে মেক্সিকোতেই প্রথম কালো জাগুয়ার রেকর্ড করা হয়ে ছিল। ১৯৮৬ সালে, "ককসকম্ব বেসিন বন্য জীবন অভয়ারণ্য" জাগুয়ার সংরক্ষণের জন্য বিশ্বের প্রথম সুরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল। তারপর ২০০০ সালে জাগুয়ার সংরক্ষণের জন্য "জাগুয়ার সংরক্ষণ ইউনিট" নির্ধারিত করা হয়ে ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রাণীটি বিলুপ্তির কারণে রেড ডেটা বুকে নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর পরে উত্তর পেরুর সংস্কৃতির অনেক সিরামিক গুলিতে জগুয়ারকে শক্তির প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করত। কলম্বিয়ারা জাগুয়ারকে একটি পবিত্র প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করত। এবং প্রাণীটি পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম।

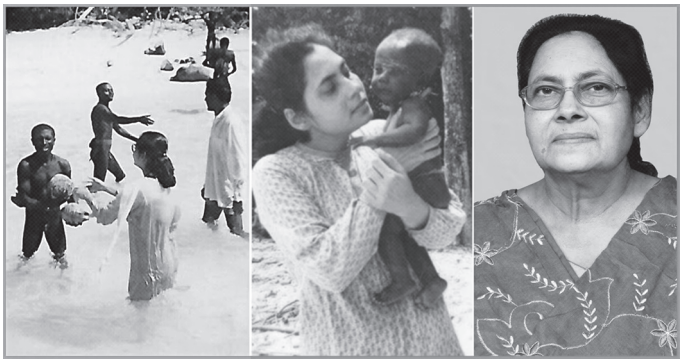
সাঁওতাল আদিবাসীদের শিকার, বনভূমি পরিমাণ হ্রাস এবং তাদের উন্মুক্ত আদর্শ পরিবেশ না থাকার কারণে পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। বাঘ ও সিংহের পর পৃথিবীর সব থেকে বিরল প্রজাতির প্রাণীটি।

লেখক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: abuhanifsk1998@gmail.com • M. 6296933149

অজয় মজুমদার

সেন্টিনেলী ও জারোয়া, জনগোষ্ঠীতে ড. মধুমালার প্রথম প্রবেশ



সেন্টিনেলীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সভ্যজগতের প্রথম যে মানুষটি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করেন, তিনি হলেন একজন বাঙালি নৃতত্ত্ববিদ ড. মধুমালা চট্টোপাধ্যায়। এই জনগোষ্ঠী ছাড়াও জারোয়া উপজাতির মহিলাদের সঙ্গে তিনি মেয়ের মতো মিশতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত "ট্রাইবস অফ কার নিকোবর" বই ছাড়াও তাঁর লেখা গবেষণা পত্র গুলি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, অক্সফোর্ড ও হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে।

আন্দামান জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হল সেন্টিনেলী জনগোষ্ঠী। বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বসবাসরত একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। গ্রেট আন্দামান উত্তর সেন্টিনেলী দ্বীপপুঞ্জে এই জনগোষ্ঠীর বাস। এদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল— বহিরাগত কাউকে দেখলেই আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখাবে। এমনকি হত্যা করতেও তারা পেছাবে না।

পেশাগত দিক দিয়ে এই সেন্টিনেলী জনগোষ্ঠী মূলত একটি শিকারি নির্ভর জাতি। বন্যপ্রাণী শিকার করা, মাছ ধরা, এবং বন্য লতা পাতার মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করে। এখনো পর্যন্ত তাদের মধ্যে কৃষিকাজ করা বা আগুন ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এরা পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াই বেঁচে আছে। তাদের স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন আদিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয়।



২০১৩ সালের এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বিশ্বের বর্তমানে একশোটিরও বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে— যাদের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার কোন যোগাযোগ নেই। তাদের অর্ধেকেই আমাজন জঙ্গলে বসবাস করে।

বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীরা সাধারণত তাদের নিজেদের অঞ্চলে স্বাধীন ভাবে বসবাস করে। বাইরে থেকে তাদের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে বহুবার । কিন্তু দীর্ঘকাল যাবত বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তাদের অঞ্চলে হঠাৎ করে কোন নতুন সম্প্রদায় প্রবেশ করলে তারা সহ্য করতে পারে না । অনেক সময় তারা হিংস্র হয়ে ওঠে এবং বহিরাগতকে হত্যা করতেও পারে । অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীরা আগুন ও চাকার ব্যবহার সম্পর্কে জানে না।

বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে আকস্মিক যোগাযোগের ফলে হঠাৎ যে সমস্যা তৈরি হয় এবং তাদের নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ২০০৯ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীদের স্বেচ্ছায় মানব সভ্যতা থেকে পৃথক রাখতে কয়েকটি চিঠি দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বিশেষ প্রয়োজন বা যুক্তিসঙ্গত কারণ বশত তাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন হলে বিশেষ অনুমতি ও সুরক্ষার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়।

সেন্টিনেলী ভাষা, সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় এটি আন্দামানী ভাষা গুলোর থেকে অন্যরকম। ধর্ম সম্পর্কে এদের কোন ধারণা নেই । সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী জানা যায়নি সঠিকভাবে। তবে অন্যান্য আন্দামানী আদিবাসীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেমন ওঙ্গে। আদিবাসী অধিকার বিষয়ক একটি সংস্থা সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল ইন্দোনেশিয়া সরকারকে বিচ্ছিন্ন আদিবাসীদের স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন থাকার অধিকার এবং তাদের সঙ্গে অবৈধ যোগাযোগ রোধের আহ্বান জানায়।

যিনি এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন তার সম্বন্ধে সকলের উৎসাহ আছে। ড. মধুমালা দেবী কলকাতা শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বড় হয়ে ওঠেন। বাবা রেলের আধিকারিক ছিলেন, মা প্রণতি চট্টোপাধ্যায় খুবই শিক্ষা অনুরাগী ছিলেন। মধুমালা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ থেকে নৃতত্ত্বের সাম্মানিক ডিগ্রী এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট হন প্রথম শ্রেণীতে। তিনি আন্দামানের আদিবাসীদের জিনগত প্রকরণের উপর জেনেটিক স্টাডি অ্যামং দ্য অ্যাবঅরিজিন্স অফ দ্যা আন্দামান (Genetic study among the aborigines of the Andaman) নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আন্দামানের উপজাতিদের উপর ক্ষেত্র "সমীক্ষার মাধ্যমে গবেষণা করার জন্য অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া গবেষণা সংস্থায় পিএইচডি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করেছিলেন। অনেক বাধা বিপত্তি কটিয়ে সেই ফেলোশিপ নিয়ে কাজ করেছিলেন ।জারোয়া ও সেন্টিনেলী জনগোষ্ঠীদের নিয়ে তিনি দীর্ঘ গবেষণা করেন। এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন। তিনি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ছয়টি উপজাতি গ্রেট আন্দামানিজ, ওঙ্গে, জারোয়া, সেন্টিনেলী শম্পেন এবং নিকোবরিজ প্রত্যেক উপজাতি দের নিয়েই তিনি কমবেশি কাজ করেন।

১৯৭০ সালে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটি ছোট

দল সেন্টিনেলীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তীর ধনুকের আক্রমণে তাদের ফেরত আসতে হয়। ১৯৭৪ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক একটি দল পুলিশের সুরক্ষায় উত্তর সেন্টিনেলী দ্বীপে গেলে তাদের একই ধরনের অভ্যর্থনা নিয়ে ফিরে আসতে হয়। তাদের ডকুমেন্টারির আকর্ষণীয় শিরোনাম ছিল "ম্যান ইন সার্চ অফ ম্যান"। পূর্বের একাধিক অসফলতা শর্তেও ডঃ মধুমালা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন। ১৩ জনের একটি দল নিয়ে ১৯৯১ সালে ৪ঠা জানুয়ারি উত্তর সেন্টিনেলী দ্বীপে যান। স্থানীয় প্রশাসনের জাহাজ তারমুগ্লির সহায়তায় উক্ত দ্বীপে যান। সকাল আটটা নাগাদ দ্বীপের কাছে পৌঁছাতেই জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষকে গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকতে দেখেন। তাদের বেশিরভাগই ছিল পুরুষ। তাদের মধ্যে চারজন তীর ও ধনুক সজ্জিত ছিল। জাহাজ থেকে প্রায় চার ঘন্টা ধরে নারকেল ফেলতে থাকে। আর জনগোষ্ঠী সেই নারকেল কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নারকেল শেষ হলে জাহাজ পুনরায় ফিরে যায়।তারা দুপুর দুটো নাগাদ আবার সেই স্থানে ফিরে আসে। এই সময় সেন্টিনেলীরা একটি স্বতন্ত্রে ওঙ্গে উপভাষায় চিৎকার করে যোগাযোগ দলটিকে স্বাগত জানায়। কিছুক্ষণ পরে একটি সাহসী সেন্টিনেলী যুবক নারকেল সংগ্রহ করতে নৌকার কাছে আসে। তারপর ডঃ মধুমালা এবং অন্যান্যরা হাঁটু জলে নেমে তাদের হাতে নারকেল দিতে থাকেন। একই সেন্টিনেলীদের সঙ্গে প্রথম সফল যোগাযোগ। ২১ ফেব্রুয়ারি ডঃ মধুমালা চট্টোপাধ্যায় দলের সদস্যদের নিয়ে আবার আসেন। সেই সময় ওরা চিৎকার করে ওঙ্গী ভাষায় বলে 'নাড়িয়ালী জাবা জাবা' অর্থাৎ আরও নারকেল চাই।

১৯৯১ সালে ৫ই জানুয়ারি ডঃ মধুমালা জারোয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যান। ডঃ মধুমালাকে নৌকায় দেখে জারোয়া মহিলারা তাকে "মিলালে চেরা" অর্থ বন্ধু এখানে এসো বলে চিৎকার করে সমুদ্র বীচে আসতে বলে। সেখানে ডঃ মধুমালার সঙ্গে জারোয়াদের অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাকে জারোয়াদের কুঁড়েঘরে আমন্ত্রণ জানায়। বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে ও তাদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে নিতে এবং কখনো কখনো বাড়ির কাজে হাত দিতে আমন্ত্রণ করে। মধুমালাকে তারা গাছের ছাল, লতা ,পাতা দিয়ে গহনা তৈরি করে উপহার দেয়। মোট আট বার জারোয়াদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন।

ডঃ মধুমালা চট্টোপাধ্যায় এর কাজ নৃতত্ত্বের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই গবেষণা ভারতকে নতুন করে সম্মানিত করেছে।

লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

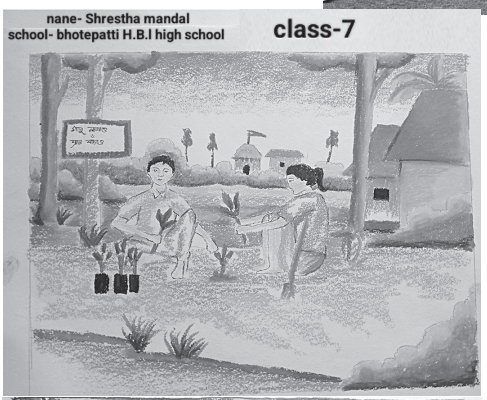
email:majumdarajay@gmail.com • M. 8918824281

সংবাদ



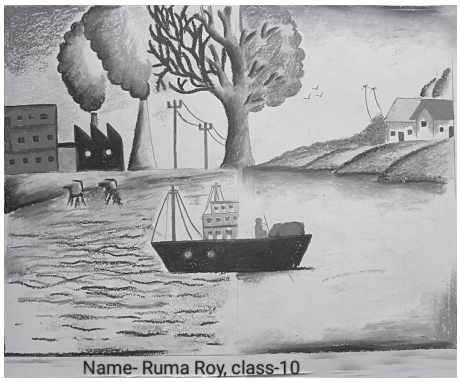
বসুন্ধরা দিবস

২২ এপ্রিল জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব এবং ময়নাগুড়ির ভোটপট্টি শাখার উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী বসুন্ধরা দিবস পালন করা হয়। আলোচনাসভা, ক্যুইজ ও গাছ লাগানো সহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। সারাদিন ব্যাপী এই কর্মসূচিতে ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে। সন্ধ্যেবেলায় এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জ্যোতির্ময় রায় ডাকুয়া, আশিষ কুমার বসাক, আকাশ চৌধুরী, ড. রাজা রাউত, ডা. গৌতম ঘোষ সহ আরও অনেকে। বক্তারা বসুন্ধরা দিবসে সকলকে হাতে হাত মিলিয়ে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান।









দিগন্ত পাল

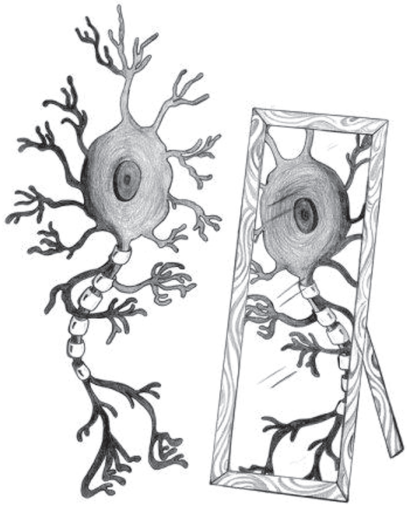
এম্প্যাথেটিক মিরার নিউরোন



অপরকে হাই তুলতে দেখে আপনারও কি হাই ওঠার উপক্রম হয়? যদি আপনার এই স্বভাব নাও থাকে, পরিচিতদের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন, অনেকেই নিজের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করে থাকবেন। গাড়িতে বসে ঘুমানোর বদঅভ্যাস থাকায় আমি সবসময় গাড়ির চালকের পাশে বসাকে এড়িয়ে চলি। আমরা কখনও বৈজ্ঞানিকভাবে ভেবে দেখেছি যে কেন রোম্যান্টিক চলচ্চিত্র বা পার্টি ভিডিও সং এত বাণিজ্যিকভাবে সফল হয় যদিও চলচ্চিত্রে বা ভিডিও সং-এ দর্শক রোম্যান্স বা পার্টি করার সুযোগ পান না? কেন অনেক ক্ষেত্রেই অপরকে কাঁদতে দেখে বা অপরের দুঃখে আমাদেরও খারাপ লাগে? ধর্মগ্রন্থসমূহে মানুষকে অন্যান্য জীব ও আর পাঁচজন মানুষের প্রতি সহমর্মিতার উপদেশ দেওয়া হয়— অপরের আনন্দকে অনুভব করা, অপরের দুঃখকে ভাগ করে নেওয়া— মোদ্দা ব্যাপার হল যে, অপরের মানসিক অবস্থাকে নিজের মস্তিষ্কে অনুভব করা। অপরের মানসিক অবস্থাকে নিজের মস্তিষ্কে অনুভব করার ক্ষমতা হলো 'এম্প্যাথি' বা 'সহমর্মিতা' যা সাধারণত সকল মানুষের মধ্যে কম-বেশী থাকলেও তাকে আরও বাড়িয়ে নেওয়া যায়। সকল বিজ্ঞানী একমত না হলেও অনেক বিজ্ঞানীর মতে, মস্তিষ্ক বিদ্যমান এমন যে কোন প্রাণীর মধ্যে এই 'এম্প্যাথি'-র একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো— মস্তিষ্ক যে অজস্র স্নায়ুকোষ বা নিউরোন নিয়ে গঠিত, তাদের মধ্যে কিছু বিশেষ প্রকার স্নায়ুকোষ যার নাম 'এম্প্যাথেটিক মিরার্ নিউরোন', সংক্ষেপে 'মিরার্ নিউরোন' বা 'মিরার্ স্নায়ুকোষ' যারা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকে।

নামকরণের যথার্থতা

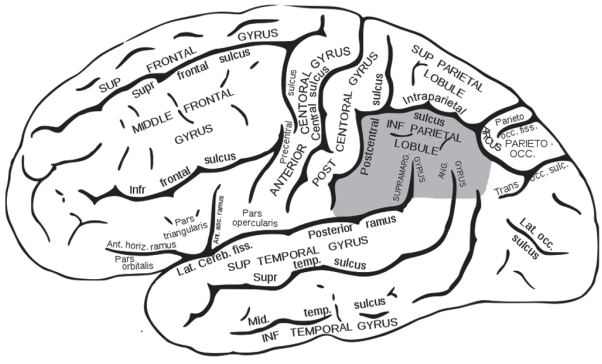
ম্যাকাক বানরদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে; কোনো বানর কোনো কাজ করলে কিংবা অন্য কোনো বানরকে বা মানুষকে সেই একই কাজ



করতে দেখলে, উভয় ক্ষেত্রেই বানরটির মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু স্নায়ুকোষ উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। বহু বিজ্ঞানীর মতে বানরের ঐ স্নায়ুকোষগুলি 'মিরার্ স্নায়ুকোষ'-র উদাহরণ যারা নিজে করা ও দেখার মধ্যে পার্থক্যটুকু কিছুটা ঘুচিয়ে দেয়। এই স্নায়ুকোষগুলির সাহায্যে একজনের মস্তিষ্কের অনুভূতি আরেকজনের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয় কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, একজনের মস্তিষ্কের কোন নির্দিষ্ট অংশের উত্তেজনা আরেকজনের মস্তিষ্কের একই অংশে 'ভার্চুয়াল রিয়ালিটি'-র ন্যায় স্টিমুলেটড হয় বলে এই স্নায়ুকোষের নামে 'মিরার' অর্থাৎ 'দর্পণ' বা 'আয়না' শব্দটির ব্যবহার হয়।

মানুষে-মানুষে পারস্পরিক ধারণা অর্জনে মিরার স্নায়ুকোষের ভূমিকা

আমাদের চলাফেরা বা অঙ্গভঙ্গি বা বিভিন্ন আবেগ সংক্রান্ত মুখভঙ্গি—এই সকলই মস্তিষ্কের 'প্রিমোটর কর্টেক্স' ও 'ইনিরিয়র্ প্যারাইটাল কর্টেক্স' অংশের স্নায়ুকোষগুলি পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্বাচন করে এবং কাজগুলি ঠিক কিভাবে সংঘটিত হবে তার পরিকল্পনা করে। যখন আমরা কোনো বস্তুর দিকে এগিয়ে যাই ও তাকে ধরি কিংবা এগিয়ে গিয়ে বস্তুটিকে ঠেলি বা টানি কিংবা কোনো মুখভঙ্গি করি— প্রত্যেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের উপরোক্ত দুটি অংশের ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুকোষের দলকে উদ্দীপিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। ঐ স্নায়ুকোষের দল এরপর 'প্রাইমারী মোটর কর্টেক্স'-এর কিছু স্নায়ুকোষকে উদ্দীপিত করে এবং তারপর প্রাইমারী



প্যারাইটাল কর্টেক্স

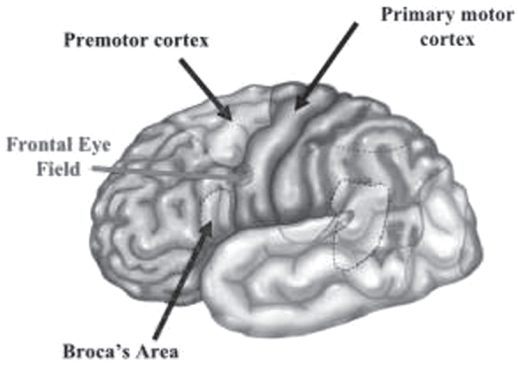
মোটর কর্টেক্স-র উদ্দীপিত স্নায়ুকোষগুলি নির্দিষ্ট পেশীগুলিতে পরপর কতগুলি ঝাঁকুনি বা সংকোচনের মাধ্যমে আমাদের মুখভঙ্গি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলন ঘটায়।

যখন আমরা উপরোক্ত কাজগুলি নিজে না করে কাউকে ঐ কাজগুলি করতে দেখি, তখন প্রিমোটর কর্টেক্স ও ইনিফিরিয়র্ প্যারাইটাল কর্টেক্স-র

পূর্বোক্ত স্নায়ুকোষের দলগুলির সকল স্নায়ুকোষের বদলে কেবল মিরার্ স্নায়ুকোষগুলি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। প্রিমোটর কর্টেক্স ও ইনিফিরিয়র্ প্যারাইটাল কর্টেক্স-র মিরার্ স্নায়ুকোষগুলি আমাদের মস্তিষ্ককে নিজেদের আর বাকি মানুষদের কথা বলা, কাজ-কর্ম, ও আবেগের বহিঃপ্রকাশের ভঙ্গিমা বুঝতে; সেগুলিকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে; ও সেগুলি তুলনা করতে সাহায্য করে। এই কারণে বলা যেতে পারে, মিমিক্রি আর্টিস্ট বা অনুকরণ শিল্পীদের দক্ষতা নিহিত থাকে মূলত প্রিমোটর কর্টেক্স ও ইনিফিরিয়র্ প্যারাইটাল কর্টেক্স-র মিরার্ স্নায়ুকোষগুলিতে!

ভাষা ও মিরার্ স্নায়ুকোষ

আমাদের মস্তিষ্কের 'ব্রকাসএরিয়া' অংশটি ভাষা শেখা ও ভাষা ব্যবহারে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মজার বিষয় হলো এই যে, এই



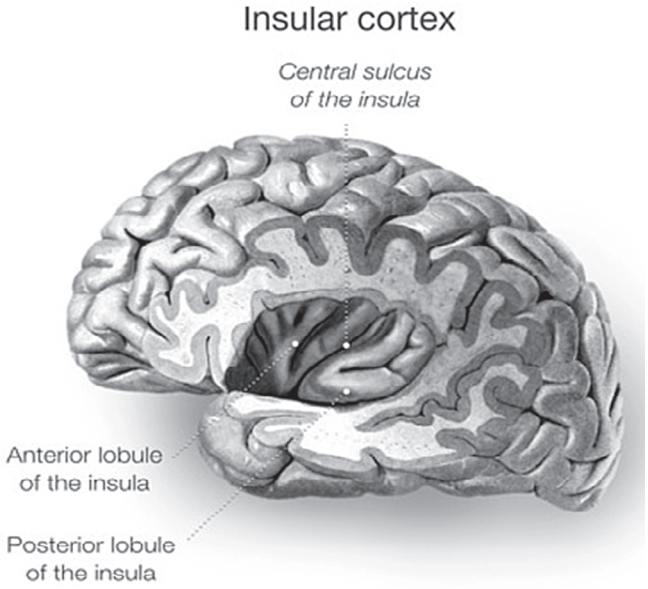
অংশেও কিছু মিরার স্নায়ুকোষ পাওয়া যায়! ব্রকাস এরিয়া-র মিরার্ স্নায়ুকোষ যেমন ভাষা শেখায় সাহায্য করে, তেমনি একাধিক ভাষার ব্যবহার ও ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কথোপকথন প্রসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় শব্দের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভাষার বিবর্তনেও মিরার স্নায়ুকোষের ভূমিকা থাকতে পারে!

আনন্দ ভাগ করে নিতে বা সমবেদনায় মিরার্ স্নায়ুকোষ কিভাবে সাহায্য করে?

কথিত আছে, দুঃখ ভাগ করে নিলে কমে আর আনন্দের ভাগে তা আরও বাড়ে।

আমস্টারডামে নেদারল্যান্ড ইন্সটিটিউট ফর নিউরোসায়েন্স এর বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম ইঁদুরদের উপর পরীক্ষা করে জানতে পারেন যে; শুধু অপরের কথা বলা বা চলাফেরা বা কাজ-কর্ম বা অঙ্গভঙ্গি নয়, এম্প্যাথেটিকমিরার্ স্নায়ুকোষ অপরের শারীরিক কষ্ট অনুভব করাও সম্ভব করে তোলে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে, নিজে শারীরিক কষ্ট ভোগ করার সময়ে এবং অপরের শারীরিক কষ্ট পর্যবেক্ষণ করার সময়ে ইঁদুর ও মানুষের মস্তিষ্কের একই অংশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে! এই অংশটির নাম 'অ্যান্টেরিয়া সিঙ্গুলেট কর্টেক্স' যার মিরার্ স্নায়ুকোষগুলি শারীরিক কষ্টের সরাসরি অনুভব ও অপরের শারীরিক কষ্ট পর্যবেক্ষণ করা— উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দীপিত হয়, তবে শারীরিক কষ্টের সরাসরি অনুভবে অ্যান্টেরিয়া সিঙ্গুলেট কর্টেক্স-র উদ্দীপিত স্নায়ুকোষের তালিকায় কিছু ননমিরার্ স্নায়ুকোষও থাকে।

শারীরিক কষ্টের সরাসরি অনুভব ও অপরের শারীরিক কষ্ট পর্যবেক্ষণ করার সময়ে মনুষ্য-মস্তিষ্কে উত্তেজনার পার্থক্য—



অপরের শারীরিক কষ্টের পাশাপাশি অপরের দুঃখে বা আনন্দে আমরা সহমর্মী হতে পারি মস্তিষ্কের 'ইন্সুলার কর্টেক্স'-এ উপস্থিত মিরার্ স্নায়ুকোষগুলির বদান্যতায়।

অটিজমও সাইকোপ্যাথি

মানুষের মধ্যে অটিজম রোগের লক্ষণ হিসাবে যে মোটর ডিসঅর্ডার (এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী চলন দেখা যায় ও সেই প্রয়োজনাতিরিক্ত চলন ব্যক্তিটির ইচ্ছাধীন হয় না) দেখা যায়, কিংবা যে ভাষা সমস্যা বা মানুষের সাথে কথোপকথনে সমস্যা হয়, অথবা আর পাঁচজনের মনের ভাব বোঝায় যে অক্ষমতা প্রতিভাত হয়; সেই সকল ক্ষেত্রে মিরার্ স্নায়ুকোষের অভাব বা মিরার্ স্নায়ুকোষের গঠনগত সমস্যা বা নিষ্ক্রিয়তাকে একটি কারণ হিসাবে সন্দেহ করা হয়।

একজন সাইকোপ্যাথ-র অ্যান্টেরিয়া সিঙ্গুলেট কর্টেক্স অথবা ইন্সুলার কর্টেক্স-এ মিরার্ স্নায়ুকোষ সংক্রান্ত সমস্যা থাকার জন্যই অপরের শারীরিক ব্যথা বা খারাপ লাগা দেখলেও এঁদের মস্তিষ্কের যথাক্রমে অ্যান্টেরিয়া সিঙ্গুলেট কর্টেক্স বা ইন্সুলার কর্টেক্স খুব একটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে না।

উপরের সম্পূর্ণ আলোচনা সামগ্রিকভাবে যে ধারণাকে তুলে ধরে তা হলো, মস্তিষ্ক বিদ্যমান এমন বহু সমাজবদ্ধ প্রাণীর সমাজবদ্ধ হওয়ার পেছনে এম্প্যাথেটিকমিরার্ স্নায়ুকোষের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে!

লেখক তথ্যপ্রযুক্তি পেশাদার এবং বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: digantapaul15@gmail.com • M. 9874556152

অ জ য় না থ

মরুভূমিতে বন্যা

১৬ই এপ্রিল ২০২৪। একদিনের বৃষ্টিতে, মরু রাজ্যের শহর দুবাই যাকে সিঙ্গাপুর আর হংকং-এর সমান মনে করা হয়, জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। বিশ্বের যে কোন অতি উন্নত ও বড় শহর বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে যাওয়া নুতন কথা নয়। কিন্তু দুবাইয়ের জলমগ্ন হওয়া আমাদের একটা বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিশ্বের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলের মধ্যে United Arab Emirets (U A E) বা সংযুক্ত আরব আমিরশাহি অন্যতম। সেখানে একটা বড় বৃষ্টি এবং বন্যা কি প্রযুক্তির ব্যবহার করে বৃষ্টি ঘটানোর জন্য হয়েছে না কি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য। এ নিয়ে মিডিয়া জুড়ে শুরু হয়েছে চাপান উতর।



দুবাইয়ের ইতিহাস এবং ভূগোল নিয়ে একটু আলোচনা না করলে মূল বক্তব্যে আসা যাবেনা। আষ্টাদশ শতকে দুবাই একটি মৎস্যজীবীদের গ্রাম হিসাবে পরিচিত ছিল। মাত্র ৭০০/৮০০ মৎস্যজীবী বাসকরতেন। ১৮২২ সালে একজন ব্রিটিশ নেভেল অফিসার তার সার্ভে রিপোর্টে বলেন যে দুবাই পারস্য উপসাগরের কোলে উপবৃত্তাকার শহর। জনসংখ্যা প্রায় একহাজার এবং সমুদ্রের উপকূল অংশ মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা যাতে সমুদ্রের জল শহরে না ঢুকে পড়ে তার জন্য। বিংশ শতকের শুরুতে দুবাই একটি মুক্ত বন্দর হিসাবে গড়ে ওঠে। ড্রেজিংয়ের সাহায্যে বন্দরের গভীরতা বাড়ানো হয় বড় বড় জাহাজের অবাধ যাতায়াতের জন্য। দুবাই ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে পেট্রোলের খোঁজ শুরু হয় এবং দুবাই উপকূলে পেট্রোলিয়াম উত্তোলন শুরু হয়। ধীরে ধীরে সোনার ব্যবসা এবং পর্যটন শিল্প বিস্তারিত হয়। তৈরি হয় স্কাই স্ক্রেপার। বিশ্বের উচ্চতম বাড়ি বুর্জখলিফা দুবাইতে অবস্থিত। পাঁচতারা হোটেলের সংখ্যায় দুবাই এখন বিশ্বের ২য় স্থানে রয়েছে। এখন প্রায় ৩৬ লক্ষ মানুষের বাস এবং বিলাসবহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষেরাই দুবাইতে বেড়াতে আসেন।

ভৌগোলিক দিক থেকে দুবাই পারস্য উপসাগরের তীরে ২৫.২৭ অক্ষাংশ ও ৫৫.৩১ দ্রাঘিমা রেখার উপর অবস্থিত। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা মাত্র ১৬ মিটার। দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মরুভূমি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত তাই বালুকাময়। ঝিনুক ও কোরালের গুড়ো থেকে তৈরি বলে দুবাইয়ের বালুকা সাদা রঙের এবং খুব মিহি। দুবাইয়ের দক্ষিণ পূর্বদিকে রয়েছে হাজার বা পাথুরে পর্বত। বিস্তৃতি প্রায় ৭০০ কিলোমিটার। পর্বতমালার উচ্চতা এক থেকে দেড় কিলোমিটার। তার মধ্যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জাবাল সামসের উচ্চতা ৩০০৯ মিটার। পর্বতমালা ওমান উপসাগর থেকে ৫০-১০০ কিলোমিটার ভেতরে। ফলে আরব সাগর থেকে ওমান উপসাগরে সরে আসা নিম্নচাপ ইত্যাদির প্রভাব সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পড়ে না।

দুবাইয়ের জলবায়ু ভ্লাদিমির কোপেনের বিভাজন অনুসারে ক্রান্তীয় উষ্ণ মরু জলবায়ু। গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত উষ্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী। জুলাই এবং অগাস্ট উষ্ণতম মাস। গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৪০ এবং ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে জুলাই মাসে ৪৯.০ ও অগাস্ট মাসে ৪৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় জানুয়ারি মাসে। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০.৮ মিলিমিটার। বছরের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৯.২ মিলিমিটার। গত কয়েক দশক ধরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ছে। এখন বছরে প্রায় ১১০.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। গত দুই দশক ধরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। তাই ক্লাউড সিডিং বা কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হচ্ছে। দুবাই অতি আধুনিক বিলাসবহুল শহর। চারপাশে উড়ালপুল এবং শান বাঁধানো পথঘাট যা শহরে একটি হিট অইল্যান্ডে পরিনত করেছে। জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়াছে বছরে ৪১০ পি পি এম হারে ২০১১ সাল থেকে। ৪১০ পি পি এম সহনশীল মাত্রার চেয়ে অনেকটাই বেশি। অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাসের মাত্রাও বাড়ছে সমানতালে। উষ্ণায়ন ঘটছে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। এলনিনো লা নিনা, নর্থপোলার ভরটেক্স, পৃথিবীর অক্ষরেখার বিচ্যুতি ইত্যাদির প্রভাব পড়ছে পৃথিবীর আবহাওয়া মন্ডলে। এর ফলে পশ্চিমীঝঞ্ঝার প্রভাব পড়ছে এশিয়ার মরু অঞ্চলে। বৃষ্টিপাত সরছে পশ্চিমদিকে। রাজস্থানের মরুভূমিতে বন্যা হচ্ছে বর্ষাকালে। দুবাইয়ে ১৬এপ্রিলের আগে থেকে ক্লাউড সিডিং প্রক্রিয়া চলছিল। একটি জোরালো পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব পড়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উপরে। উত্তর পশ্চিমের বাতাস পারস্য উপসাগর থেকে নিয়ে এসেছে জলীয়বাষ্প। জাবাল বা পাথুরে পাহাড়ের জন্য তৈরি হয়েছে জলদ মেঘ। ২৪ ঘন্টায় ১২০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল বলে দুবাই শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। সমুদ্রের দিকটি দেওয়াল ঘেরা। বৃষ্টির জল গড়িয়ে যাবার ব্যবস্থা নেই। শান বাঁধানো পথঘাটের জন্য জল দাঁড়িয়ে গেছে শহর জুড়ে। ফলে গাড়িঘোড়া, পথঘাট, ঘরবাড়ি সব চলেগেছে জলের নীচে। এ শুধু দুবাই নয় বিশ্বের সব আধুনিক শহরের একই হাল হয় সামান্য অধিক বৃষ্টিতে। দুবাইতে তো গোটা বছরের বৃষ্টি হয়েছে একদিনে।

লেখক গবেষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: nathajoy@gmail.com • M. 9433802339

মৃদুল শ্রীমানী

কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে: গ্যালিলিওর জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন

আজ থেকে চারশ বছর আগে, ১৬২৩ সালে বেরিয়েছিল একটা বই, ইল স্যাগিয়াটোর। ওই বইটাকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় 'দি অ্যাসায়ার'।

অ্যাসায়ার ছিল এক ধরনের পেশাদারদের নাম, যাদের কাজ ছিল কোনো ধাতুর বিশুদ্ধতা ও মূল্যমান যাচাই করা।

অ্যাসায়ার বইটি সেই কাজটি করল।

পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে চালু ধারণাগুলি কতটা যথার্থ, যুক্তির ধোপে সেগুলি কতদূর টেঁকে তাই নিয়ে লেখা।

বইটি লিখেছিলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galilei)। ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিন। ১৫৬৪ সালে তিনি জন্মেছিলেন।



বাবার বড় ছেলে ছিলেন তিনি। ভিনসেনজো গ্যালিলি ছিলেন বীণকর আর সুর নিয়ে তত্ত্বগত চর্চায় ডুবে থাকা মানুষ। একটা খোল, তার উপর কাঠের একটা দণ্ড, তাতে তার আটকে সুরেলা বাদ্যযন্ত্র মানুষ তৈরি করেছে প্রাচীনকাল থেকে। মিশরে, গ্রীসে, ভারতে, বহুদিন ধরেই বীণা, সেতার, সুরবাহার, সরোদ, এসরাজ, বেহালা, ভায়োলিন এদের কতো কদর ছিল। ভিনসেনজো সেই তারবাদ্য তৈরির দক্ষ কারিগর শুধুমাত্র ছিলেন না, তিনি গাণিতিক ভাবে বিষয়টি লক্ষ্য করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

এইসব বীণকররা দেশে দেশে সেতার, ম্যান্ডোলিন, গিটারের তার বাঁধতে বাঁধতে জানতেন, কতটা টান দিলে সুরে বাঁধা তার কি রকম তীব্রতায় স্বর তোলে।

ভিনসেনজো গ্যালিলি তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান গ্যালিলিওকে তাঁদের দীর্ঘদিনের পারিবারিক বাসস্থান ফ্লোরেন্স শহরের থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে ভ্যালমব্রোসা অ্যাবে নামে একটি মঠের আশ্রমস্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। মধ্য কৈশোরের দিনগুলি, বিশেষতঃ ১৫৭৫ থেকে ১৫৭৮ অবধি সেখানেই তর্কবিদ্যা বা লজিক নিয়ে রীতিমতো তালিম পেয়েছিলেন গ্যালিলিও। আর ১৫৮১ সালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে ম্যাট্রিকুলেট হলেন। এবার সেখানে ওঁর ডাক্তারি পড়ার কথা। কিন্তু কয়েকটি বছর সেখানে পড়ে শেষ পর্যন্ত ১৫৮৫ সালে একুশ বছরের তরুণ গ্যালিলিও কোনো ডিগ্রি না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লেন। তারপর এখানে সেখানে একে তাকে গণিত পড়িয়ে নিজের খরচ তোলা শুরু করেন।

গণিতে আশ্চর্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তিনি। নামও ছড়িয়ে পড়ছিল দ্রুত। ১৫৮৮ সালে দুম করে ওই ছেড়ে আসা পিসা বিশ্ববিদ্যালয়েই গণিতের অধ্যাপকের চেয়ারে আসীন হয়ে রীতিমতো পাঠদানের আবেদন করে ফেললেন গ্যালিলিও। কিন্তু ডিগ্রিহীন তরুণের সে আবেদন নাকচ হয়ে গেল।

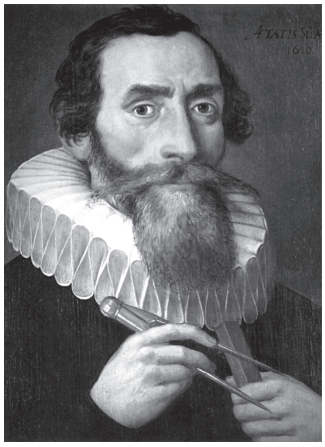
অথচ ভিতরে ভিতরে গণিতের উচ্চস্তরের প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। শুধুমাত্র ডিগ্রিটুকু যা ছিল না। গ্যালিলিও হলেন সেইসব আধুনিক তত্ত্বাচার্যদের অন্যতম, যে ধরনের চিন্তাবিদগণ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, প্রকৃতির নিয়মগুলি গণিতের সূত্রে গাঁথা। অ্যাসায়ার বইতে গ্যালিলিও লিখেছিলেন, এই মহাবিশ্ব যেন এক অসাধারণ সমুন্নত গ্রন্থ, যে গ্রন্থ রচনার ভাষাটি হল গণিত আর তার কুশীলবরা হল ত্রিকোণ, বৃত্ত, এবং অন্যান্য জ্যামিতিক গঠনসমূহ।

গ্যালিলিওর হাত ধরেই গণিত, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান ও পরীক্ষা ভিত্তিক পদার্থবিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ককে আধুনিক ভাবে দেখতে শেখা হল।



গণিতে গ্যালিলিওর এই প্রগাঢ় অধিকার লক্ষ্য করে গুইদোবালদো দেল মন্তে (১৫৪৫ - ১৬০৭) নামে একজন অভিজাত ব্যক্তি তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন। গুইদোবালদো বলবিদ্যা নিয়ে বেশ কিছু কাজকর্ম করেছিলেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেছিলেন।

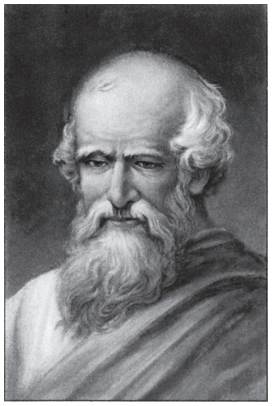
বস্তুর গতিশীলতা নিয়ে গ্যালিলিওর তত্ত্বগত ও ফলিত গবেষণায় বিরাট মৌলিকত্ব ছিল। জোহানস কেপলার বা রেনে দেকার্তের গতিবিদ্যার প্রভাব অতিক্রম করে গ্যালিলিও নিজস্ব রীতিতে গবেষণা করে চলেছিলেন। গুইদোবালদো চাইলেন এই নবীন তত্ত্বাচার্য পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে পরিচিত হোন। ১৫৮৯ সালে ওই গণিত অধ্যাপকের পদে আসীন হলেন গ্যালিলিও।



কিন্তু গভীর অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতে করতে গ্যালিলিও ক্রমেই জ্ঞানজগতের এমন একটা স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন যে, যেখানে বিজ্ঞান আর দর্শন আর আধ্যাত্মিকতা মিলেজুলে ভাবসাব করে থাকতে পারছিল না। ওই যে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা থেকে, দার্শনিকদের অনুমান থেকে

বিজ্ঞান বিভাগের আলাদা একটা এলাকা গড়ে ওঠা, এ মানুষের চিন্তন ক্ষমতার বিকাশের একটা বড় ধাপ বলে মান্যতা পেল।

যুক্তির উপরে ভক্তিকে স্থান দেওয়া যাবে না, এই হল নতুন ঘরানার স্লোগান। যা বলতে হবে পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে দেখিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে। কোনো মহামহোপাধ্যায় বলেছেন বলেই একটা উক্তি যুক্তিপদবাচ্য হয়ে যেতে পারে না। তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উৎরে যেতে হয়। সেই পরীক্ষা যেন হাজার বার, লক্ষ বার করলেও একই ফল ফলে। দুনিয়ার যে কোনো স্থানে করলেই যেন একইরকম ফল দেয়।



মনের এই গঠনের জন্য ক্রমেই অ্যারিস্ততলীয় তত্ত্ববিশ্ব থেকে গ্যালিলিও সরে যাচ্ছিলেন আর্কিমিডিসের তত্ত্ববিশ্বের দিকে। এতেই পিসা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিপদের আঁচ পেলেন। আর অ্যারিস্ততলীয় ধ্যানধারণার উপর ক্রমাগত কুঠারাঘাত করে চলায় গ্যালিলিওর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে লাগল। এভাবে চলতে চলতে ১৫৯২ সালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আর তাঁর সঙ্গে পড়ানোর চুক্তির নবীকরণ করলেন না। পিসায় পড়ানো গ্যালিলিওর বন্ধ হল বটে, কিন্তু ওই ১৫৯২ সালেই পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বরণ করে নিল। পিসার থেকে অনেক বেশি সাম্মানিক দিয়ে, ব্যাপকতর এক্তিয়ার নিয়ে পাদুয়ায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল গ্যালিলিও গ্যালিলির অধ্যাপনাবৃত্তির। এই সম্পর্ক পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বজায় রাখলেন ১৬১০ অবধি।

এই ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঘটে গেল একটা অদ্ভুত ঘটনা। এখন থেকে চারশ তের বছর আগে ১৬১০ সালে টেলিস্কোপ দেখা দিল ধনীদের বিনোদনের উপকরণ হিসেবে। কেমন দূরের জিনিসটা কাছে টেনে এনে দেখা চলে। ওতে মজলেন বহু অভিজাত মানুষ। হান্স লিপারসে নামে একজন চশমা কারিগর একটা নলের দুই দিকে লেন্স এঁটে দূরের জিনিসকে কাছে দেখাতে শুরু করলেন।



উল্লেখ করা দরকার যে লেন্স নিয়ে মানুষ বহুদিন ধরেই ভাবছিল। লেন্স নিয়ে কাজ করতে করতে শরীরপাত করেছেন বারুখ স্পিনোজা (২৪ নভেম্বর ১৬৩২-১৬৭৭)। লেন্স নিয়ে নানা ভাবনাচিন্তা করেছেন রেনে দেকার্তে (৩১ মার্চ ১৫৯৬—১১ ফেব্রুয়ারি ১৬৫০)। কিন্তু হান্স লিপারসের সরঞ্জামের গল্প শুনে ফোকাস দূরত্বের গাণিতিক তত্ত্ব প্রয়োগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দুরবিন তৈরি করে ফেললেন গ্যালিলিও। এ আর সরঞ্জামের পর্যায়ে রইল না। গণিতের সফল প্রয়োগে এ হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। এই যন্ত্র গ্যালিলিওর জীবনে অসাধারণ একটি ঘটনা ঘটিয়ে দিল। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের সাত তারিখে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গ্যালিলিও দেখতে পেলেন বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদ আইও, ইওরোপা আর ক্যালিস্টো। পরদিন দেখতে পেলেন গ্যানিমিড।

ওই দেখায় দুনিয়া গেল বদলে। পৃথিবীকে কেন্দ্রে রেখে টলেমির যে চিন্তাধারা, তার উপর মস্ত আঘাত পড়ল। বেশ দেখা গেল পৃথিবী সবকিছুর কেন্দ্রে নয়। তাহলে বৃহস্পতি গ্রহের চারদিকে ওর চারটি চাঁদ ঘোরে কী করে!

গ্যালিলিওর শিক্ষা শুরু খ্রিস্টীয় মঠে কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কার তাঁকে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বিপ্রতীপে দাঁড় করিয়ে দিল। ক্যাথলিক চার্চ প্রমাদ গুণলেন। ১৬১৫ সালে রোমান ইনকুইজিশনের তরফে গ্যালিলিওকে বেশ করে বোঝানো হল, এসব উলটো পালটা ধ্যানধারণা তাঁকে ছাড়তে হবে। সূর্যের চারিদিকে সবকিছু ঘুরছে, এই ভাবনাটাই অযৌক্তিক, অন্তঃসারশূন্য, নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা আর তার উপরে এসব কথাবার্তা পবিত্র বাইবেলের বিরোধী। তখন বড় ধর্মব্যবস্থাপক বেলারমিন গ্যালিলিওকে বেশ করে কড়কে দিয়েছিলেন। গ্যালিলিও কিছুদিন অন্যান্য গবেষণায় নিরত রইলেন। পরে বারবেরিনি পোপ হলেন। মাফিও কারদিনাল বারবেরিনি গ্যালিলিওর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। গুণগ্রাহীও ছিলেন। তিনি পোপ অষ্টম আরবান হিসেবে ক্ষমতাসীন হলে বন্ধু গ্যালিলিওকে ভূকেন্দ্রিক ও সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের মধ্যে একটা সমঝোতাপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক উপন্যাস লিখতে বললেন। বোঝালেন শ্যামও থাকুক, কুলও থাকুক। দুইপক্ষের ভাল ভাল জিনিসগুলো স্বাদু করে লেখো।

কলম ধরলেন গ্যালিলিও। সালভিয়াতি, সাগরেদো আর সিমপ্লিশিওর কথাবার্তার বুনোটে জন্ম নিল ডায়লগ নামে বই। সেটা ১৬৩০ সাল। ছাপা হল ১৬৩২ সালে। ডায়লগ নেড়েচেড়ে পড়ে দেখে বেশ বোঝা গেল সর্বনাশটি ঘটিয়ে দিয়েছেন গ্যালিলিও। পোপ যা চেয়েছেন, তার উলটো মুখে হেঁটেছেন তিনি। বিজ্ঞান আর যুক্তির জয়ধ্বজা ওড়াতে গিয়ে সুবিধাবাদকে পথে বসিয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র তাই নয়, হাসির খোরাক করেছেন। বন্ধু বারবেরিনি পোপ অষ্টম আরবান হয়ে আটঘাট বেঁধে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী শত্রু হয়ে উঠলেন। জীবনের বাকি দিনগুলি কারাগারের অন্তরালে থাকা পাকাপোক্ত হয়ে গেল। মৃত্যু এসে বাণীর বরপুত্রকে কোলে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ১৬৪২-এর জানুয়ারি মাসের আট তারিখে। তার এক বছর পরে, ১৬৪৩-এর জানুয়ারি মাসের চার তারিখে জন্মেছেন আইজ্যাক নিউটন। নিজের বুকের হাড়ে নিউটনের সাধনক্ষেত্রের ভিত্তিভূমি গড়ে দিয়ে গিয়েছেন গ্যালিলিও।

লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

M. 9831949581

পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

মুখ্য পরিবেশক : রবি সাহা

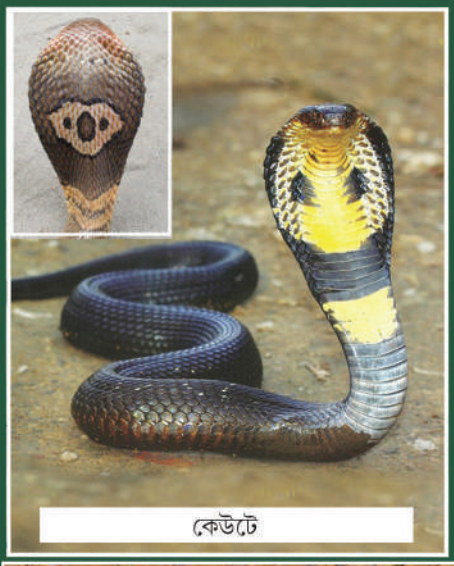
২ নং ডেকার্স লেন, কলকাতা-৬৯

M. 9830389342 / 8961066724

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বুকস্টলে পাবেন।

হোয়াটসঅ্যাপ : 7980121478

বিষধর সাপ ও কামড়ের ছবি


কেউটে


গোখরো

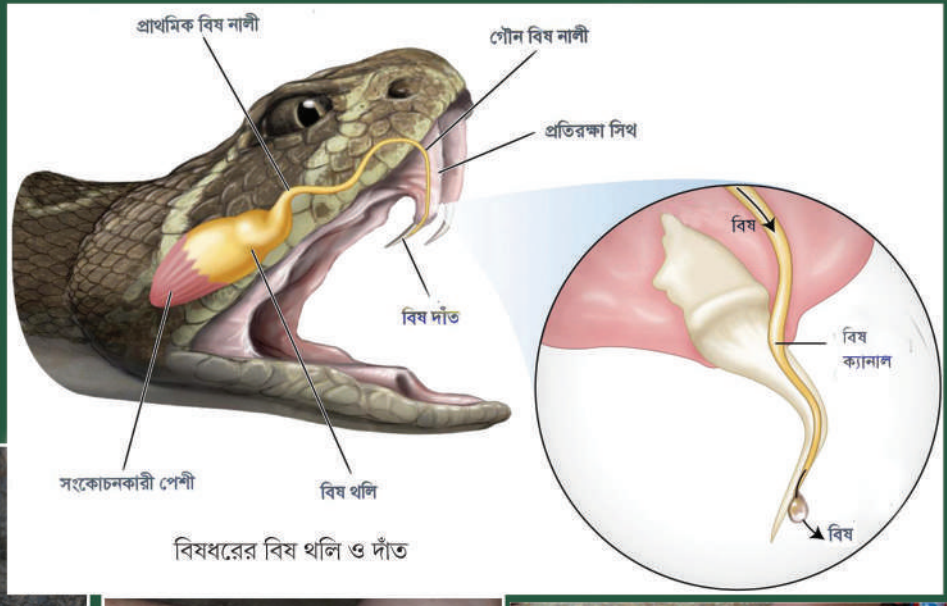

শঙ্খচূড়


কালাচ


শাঁখা মুটি


চন্দ্রবোড়া


গেছোবোড়া



বিষধরের বিষ থলি ও দাঁত


হুক নাকওয়ালা সামুদ্রিক সাপ


বিষধরের দংশন চিহ্ন


চন্দ্রবোড়ার দংশন ফল

BIGYAN ANNESWAK VOL : 21 Issue No. 3 May - June 2024 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 20/-
ISSN 2582-5674

ড. রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী : মালাবার বড় গোকুল

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Malabar civet/ Malabar large civer*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Viverra civettina*



এটি ভারতের তীব্রভাবে সংকটাপন্ন প্রজাতি। কেবলমাত্র পশ্চিমঘাট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত চলা বিভিন্ন গবেষণায় এদের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। মনে করা হচ্ছে—অল্পকিছু উপস্থিত থাকতে পারে। IUCN এর লাল তালিকায় ইতিমধ্যে তীব্র সংকটাপন্ন প্রজাতি রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ষাটের দশকের লাগামছাড়া বনাঞ্চল ধ্বংস এর প্রধান কারণ। বস্তুত পক্ষে ১৯৮৭ সালের পর এখনও পর্যন্ত প্রাকৃতিক আবাসে দেখা যায়নি একে।

মাছ : ছুরিদাঁত করাত মাছ

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Knife toothed sawfish/ narrow sawfish*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Anoxypristis cuspidata*



তরুনাস্থি নির্মিত শংকর মাছেদের নিকটতম প্রজাতি। অত্যন্ত সংকটাগ্রস্ত প্রজাতি। এই গণের অধীনে বেঁচে থাকা একমাত্র প্রজাতি এরা। সাধারণত পারস্যের খাঁড়ি থেকে শুরু দক্ষিণ জাপান, পাপুয়া নিউগিনি এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও বর্তমানে এরা সংখ্যায় খুব নগণ্য। IUCN এর লাল তালিকা অনুসারে তীব্র সংকটাপন্ন প্রজাতি। এরা সাধারণত ১০০ মিটার গভীরতার তুলনায় নরম সমুদ্রতল পছন্দ করে।

সরিসৃপ : লাল সির ছাদ কচ্ছপ

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Red crowned roofed Turtle*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Batagur kachuga*

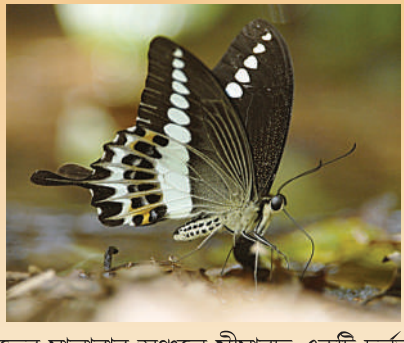


কচ্ছপদের মধ্যে মিষ্টিজলের কচ্ছপ রূপে এরা কেবলমাত্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সীমাবদ্ধ। একসময় সেন্ট্রাল নেপাল, গোটা উত্তরপূর্ব ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে পাওয়া যেত। এখন কেবল ভারতের চম্বল নদীতে প্রাকৃতিক ভাবে দেখা যায়। ১৯৭৯ সাল থেকে ভারতে এই প্রাণীটিকে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা চলছে। ২০০৪ সাল থেকে এই প্রাণীটিকে আবদ্ধ প্রজন্ম ঘটিয়ে মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাংকট্রাস্ট—সংখ্যাবৃদ্ধি চালিয়ে যাচ্ছে। এরাও তীব্র সংকটাপন্ন প্রাণী।

অমেরুদণ্ডী : মালাবার ব্যান্ডেড সোয়ালোটেইল প্রজাপতি

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Malabar swallowtail*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Paailio liomedon*



এরা দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে সীমাবদ্ধ একটি দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতি। বর্তমানে কেরালা থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। নব্বই এর দশকে এর উপর কিছু কাজ হলেও বর্তমানে এর সম্পর্কে বিশেষ তথ্য নেই। সাধারণত মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত এদের দেখা যায়। সাধারণত বছরে তিনবার এরা ডিম পাড়ে। বিভিন্ন গবেষক মহল থেকে দাবী উঠলেও এখনও IUCN এর লাল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেনি।

email : rajarouthbhbl@gmail.com M. 9474417178